সুখের কাছে

বুদ্ধদেব গুহ

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২ নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

অনিশা দত্ত
কল্যাণীয়াসু

॥ এক ॥

চাঁদের আলোয় দু-পাশের এবড়ো-খেবড়ো রুক্ষ প্রান্তর, দূরের ধুঁয়ো-ধুঁয়ো পাহাড়, কাছের জঙ্গল সমস্ত মিলিয়ে একটা রাত্রিকালীন অপরিচিতিজনিত গা-ছমছম অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে।

মহুয়ার ঘুম পেয়ে গেছে। সেই সকালে কোলকাতা থেকে বেরুনোর পর তিনশো মাইলেরও বেশি গাড়িতে এসেছে ওরা!

দিনে বেশ গরম ছিল। মার্চের শেষ। ক'টার সময় যে পৌঁছবে সে কুমারই জানে। মনে মনে কুমারের উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে মহুয়া।

বহুক্ষণ হয়ে গেছে—কোনো লোকালয়, জনমানব চোখে পড়েনি। রাস্তাটাও কাঁচা। কোথায় চলেছে ওরা কিছুই বোঝার উপায় নেই এখন।

একটু আগেই দুটো শেয়ালকে দেখেছে রাস্তা পেরুতে। জানালার নামানো কাঁচ দিয়ে হাওয়ার সঙ্গে এক এক ঝলক মিষ্টি গন্ধ আসছে। কিসের গন্ধ মহুয়া জানে না। জানতে ইচ্ছা করছে।

সামনেই একটা হেয়ারপিন বেণ্ড। কুমার গাড়ি চালাচ্ছিল। কুমারের পাশে সান্যাল সাহেব। পিছনের সীটে মহুয়া। মহুয়ার পাশে টুকিটাকি—জলের বোতল, সন্দেশের বাক্স, ডালমুট এই-ই সব।

মোড়টা ঘুরেই, গাড়িটা হঠাৎ প্রচণ্ড আওয়াজ করে বন্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ থেকেই ইঞ্জিনটা ধাক্কা দিচ্ছিল -কিন্তু শব্দটা বনেটের নীচ থেকে এল না। মনে হল গাড়ির চেসিসের নীচ থেকে এল। বন্ধ হতে হতেও, গতিতে ছিল বলেই অনেকটা এগিয়ে যাবার পর গাড়িটা থামল।

কুমার স্টীয়ারিং বাঁদিকে কাটিয়ে একটা গাছের নীচে রাস্তার পাশে দাঁড় করালো গাড়িটাকে।

মহুয়া উদ্বিগ্ন গলায় বলে উঠল, কি হল? সাংঘাতিক কিছু নিশ্চয়ই!

সান্যাল সাহেব পাইপ মুখে ভুরু তুলে কুমারের দিকে তাকালেন।

কথা বললেন না কোনো।

কুমারের প্রোফাইল দেখা যাচ্ছিল পেছন থেকে। একটা উঁচু কলারের কালো-সাদা খোপ-খোপ চৌকিকাটা জামার আড়ালে বৃষ্টিতে-ভেজা কাকের মত রোগা গ্রীবা, একমাথা হিপিদের মত চুল - ছ' ইঞ্চি সাইড-বার্ন—তীক্ষ্ন নাক।

কুমার কথা না বলে, দরজা খুলে নেমে, বনেট তুলে টর্চ জেবলে এটা-ওটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল।

সান্যাল সাহেবও নামলেন।

সামনে বনেটটা তুলে দেওয়াতে এখন কাঁচটা পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেল। সামনে আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

মহুয়া পথের দুদিকে তাকাল।

এতক্ষণ গাড়ি চলছিল বলে গাড়ির আওয়াজে গতির মত্ততায় এবং গন্তব্যে পৌঁছনোর একাগ্রতায় শুধু সামনের দিকেই চেয়ে বসেছিল ও। গাড়ির চলার শব্দে নিজেদের মধ্যের টুকিটাকি কথার মধ্যেই ডুবেছিল। বাইরে যে একটা চন্দ্রালোকিত এবং অত্যন্ত সুখপ্রদ রাত জেগেছিল, সেই রাতের কোনো অস্তিত্বই ছিল না ওর কাছে।

গাড়িটা থেমে যাওয়াতে এবং হেডলাইট নিবিয়ে দেওয়ার পর চাঁদের আলোয় এই জংলী পাহাড়ী পরিবেশের আসল রূপ স্পষ্ট হল।

কতরকম রাত চরা পাখি চমকে চমকে আবছায়া প্রান্তরে ডেকে ফিরছে। আলতোভাবে ঝিঁঝির আওয়াজ ভেসে আসছে দূর থেকে। আরও কতরকম ফিসফিসানি উঠছে হাওয়ায় হাওয়ায়। শুকনো পাতা গড়িয়ে যাচ্ছে পাথরের বুকে—একটা অপার্থিব সড়-সড় শব্দ উঠছে। আরো কতরকম শব্দ ও গন্ধ। মহুয়া অবাক হয়ে বাইরে চেয়ে রইল।

কুমার তার বাবার সহকর্মী। একই সাহেবী কোম্পানিতে কাজ করেন দুজনে। মহুয়া নিজেও একটা সাহেবী কোম্পানির

রিসেপশনিস্ট। কোলকাতায় তাদের ফ্ল্যাটে কুমার এসেছে, ও-ও গেছে কুমারের ফ্ল্যাটে বাবার সঙ্গে। ও যেখানে যেখানে গেছে সেইসব জায়গায় —এ-পার্টিতে-ও-পার্টিতে ক্লাবে গেট টুগেদারে কুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

কুমারের সঙ্গে আলাপ সান্যাল সাহেব অথবা মহুয়ার কারোই বেশিদিনের নয়। বলতে গেলে কুমারের পীড়াপীড়িতেই দোলের আগে সান্যাল সাহেবরা দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন —পালামৌর বনজঙ্গল দেখতে।

এ-এ-ই-আই থেকে ইটিনিরারী নেওয়ার কথা বাবা তুলেছিলেন কিন্তু কুমার বলেছিল যে, এসব অঞ্চল তার হাতের রেখার মত মুখস্থ। কিন্তু কী করে যে ওরা এতখানি পথ সুন্দর মসৃণ পাকা রাস্তায় আসার পর হঠাৎ এমন কাঁচা রাস্তায় এসে পড়ল মহুয়া বুঝতে পারছে না। ওর মন বলছে ওরা নিশ্চয়ই রাস্তা ভুল করেছে। রাস্তা যে ভুল করেছে এ-বিষয়ে মহুয়ার কোনোই সন্দেহ নেই। কারণ কুমার বেশ কিছুক্ষণ হল মোটেই কথাবার্তা বলছে না। অথচ সারা রাস্তা কথার ফুলঝুরি ফোটাতে ফোটাতে আসছে ও।

এই সাহেবী কোম্পানিতে ঢোকার আগে কুমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে ছিল। সেখানকার অভিজ্ঞতা, মুসৌরী পাহাড়ে তাদের ট্রেনিং সেণ্টারে পোলো খেলার কথা, ইত্যাদি ইত্যাদি নানারকম গপ্প। সত্যি কথা বলতে কি, ওর বক্‌বকানি শুনতে শুনতে মহুয়া এই দশ-বারো ঘণ্টায় বেশ বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। হয়তো সান্যাল সাহেবও হয়েছেন। কারণ তিনিও বেশ অনেকক্ষণ হল কোনো কথাই বলছেন না।

মহুয়ার ভেবে আশ্চর্য লাগছে যে, শহরে কারো সঙ্গে বহু বছরের আলাপ থাকলেও তার সম্বন্ধে বা তাকে যতখানি না জানা যায়, তার সঙ্গে বাইরে বেরোলে তাকে আট-দশ ঘণ্টার মধ্যেই অনেক বেশি জানা হয়ে যায়।

সান্যাল সাহেব একবার মহুয়ার জানালার কাছে এলেন।

বললেন, কি রে মৌ, ভয় করছে নাকি?

মহুয়ার একটু গা ছম্‌ছম্‌ করলেও বলল, না বাবা! ভয়ের কি? তারপর বলল, কিন্তু গাড়ি কি ঠিক হল?

সান্যাল সাহেব পাইপ ভরতে-ভরতে বললেন, চেষ্টা করছে কুমার।

মহুয়া বলল, গাড়ি খারাপ হওয়ার কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু আমরা কি ঠিক রাস্তায় এসেছি।

সান্যাল সাহেব চারিদিকের লোকালয়শূন্য রাতের চন্দ্রালোকিত বন-প্রান্তরের দিকে চেয়ে বললেন, বোধহয় না।

ক'টা বাজছে বাবা?

সাতটা।

মহুয়া আর কথা না বাড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে বাইরে এল। কুমার ওর বাইরে আসার শব্দ শুনে এগিয়ে এল। এসেই স্মাগলড বিলিতি সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, সরি! আ অ্যাম্ রিয়্যালি সরি।

মহুয়া সোজাসুজি বলল, কা ব্যাপাব? আমরা কোথায় এসেছি? বেত্লা থেকে কত দূরে? গাড়ির কী করবেন কিছু কি ভেবেছেন?

কুমার বলল, উই হ্যাভ বিন্ ডিস্কাসিং অ্যাবাউট দ্যাট্। কিছু একটা করব নিশ্চয়। প্লিজ, ডোণ্ট গেট আপ্সেট। এভরিথিং উইল বী অল্ রাইট্।

মহুয়া কথা না বলে দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইল। ওর ভয় করতে লাগল খুব। সন্ধ্যের আগে আগে যেখানে ওবা চা খেয়েছিল, ভুলে গেছে জায়গাটার নাম—সেখানে শুনেছিল যে গতরাতে নাকি আঠারোটি রাইফেল নিয়ে গয়া জেলা থেকে ডাকাতরা এসে এই রাস্তাতেই ডাকাতি করে গেছে। অবশ্য এই রাস্তাই সেই রাস্তা কিনা একমাত্র কুমারই তা বলতে পারে। এও বলেছিল যে, মেয়েদের নিয়ে রাতে এসব পথে যাওয়া ঠিক নয়।

আসলে এই মুহূর্তে ভয়ের চেয়েও বেশি রাগ হচ্ছে মহুয়ার। কুমারের প্রকৃত স্বরূপ এত তাড়াতাড়ি মহুয়া না বুঝলেই ভালো হতো। মানুষটাকে বড় কৃত্রিম বলে মনে হয়েছে মহুয়ার এরই মধ্যে। বাঙালীদের সঙ্গেও সবসময় দাঁত টিপে টিপে টেঁশো-ইংরেজি বলে কী যে আনন্দ পায়, কী যে এরা প্রমাণিত করতে

চায়, তা মহুয়া বোঝে না। এ বোধহয় একরকম হীনমন্যতা মনে হয়, সঠিক জানে না মহুয়া।

সান্যাল সাহেব মুখে একবারও না বললেও মহুয়ার বুঝতে ভুল হয়নি যে, এইবারে বেড়াতে আসার আসল কারণ মহুয়া আর কুমারকে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ দেওয়া। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে সান্যাল সাহেব স্বাভাবিক কারণেই উদ্বিগ্ন। বছর পাঁচেকের মধ্যেই রিটায়ার করবেন উনি।

ছেলে হিসেবে কুমার ভালো। পাত্র হিসেবেও ভালো। সত্যি কথা বলতে কি, আজ ভোরে মহুয়া যখন ওদের হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বসন্তের মিষ্টি হিমেল আমেজ-ভরা সকালে একটা অফ্‌ হোয়াইটের মধ্যে কালো কাজ করা ছাপা শাড়ি পরে কুমারের গাড়িতে ওঠে, তখন ওর ভারী ভাল লাগছিল। ও ভেবেছিল যে কুমারকে ও কিছুদিন হল জেনেছে; সেই সপ্রতিভ, যোগ্য ছেলেটিকে তার আরো অনেক বেশি ভাল লাগবে এবং তার সঙ্গে ঘর করতে চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে ওর বেশি দেরি হবে না।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে ওর খারাপ লাগতে শুরু করবে ও তা বুঝতে পারেনি।

ডাকাতির ভয়ের কথাটা সান্যাল সাহেব এবং কুমারের মনেও এসেছিল। কিন্তু মহুয়া ভয় পাবে বলে তা নিয়ে আর আলোচনা করছেন না ওঁরা।

বনেটটা বন্ধ করে দিতেই ফুটফুটে চাঁদের আলোয় দেখা গেল সামনেই একটা পাহাড় এবং পথটা সেই পাহাড়ের মধ্যে মিশে গেছে ঘুরে ঘুরে।

কুমার ঐদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকাতে সান্যাল সাহেব বললেন, কী দেখছ?

না। মানে দিস্‌ ওয়াজ নট সাপোজড্‌ টু বী হিয়ার, কুমার বলল।

হোয়াট ডু ইউ মীন? রাগত গলায় সান্যাল সাহেব শুধোলেন কুমারকে। বললেন, ভৌতিক ব্যাপার নাকি? এতক্ষণও পাহাড়টা নিশ্চয়ই ছিল। যখন আলো জ্বলছিল ও টর্চ জ্বালিয়েছিলে তখন কাছটাই নজরে আসছিল। দূরে আমরা কেউ তাকাইনি।

কুমার বলল, তা নয়। পথের এই গ্যাসে কোনো পাহাড় থাকার কথাই ছিল না।

সান্যাল সাহেব রাগ চেপে, ধরা গলায় বললেন, রাস্তা ভুল করলে রাস্তায় আনচার্টেড পাহাড় নদী অনেক কিছুই পড়বে। যে-রাস্তায় তোমার আসার কথা, সে-রাস্তা নিশ্চয়ই কোথাও ফেলে এসেছ।

তারপর একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর হয়ে বললেন, গাড়িটাও গেল বন্ধ হয়ে। তোমাকে এতবার করে বললাম রামবিলাসকে নিই, আমার গাড়ি নিয়ে আসি—তা তুমি জেদ ধরলে যে তোমার গাড়িতেই যেতে হবে। গাড়ি নিজে না চালালে রাফিং হয় না। এখন করো রাফিং।

মহুয়া ব্যাপারটাকে লঘু করার জন্য মধ্যে পড়ে হেসে বলল, কুমার আপনি তো গাড়ির সবকিছু বোঝেন বলেছিলেন, বলুন তো দেখি কি হয়েছে?

কুমার ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামিয়ে বলল, বুঝতে পারছি না। এখন হোয়াট টু ডু?

কুমার কিন্তু তখনও সপ্রতিভ। পুরো ব্যাপারটা যে তার জন্যই ঘটেছে সে-কথা সে তখন স্বীকার করলেও, পুরোপুরি মেনে নিতে রাজী নয়।

সে বলল, আসুন গাড়িতে বসে ভাবা যাক কী করা যায়!

সান্যাল সাহেব দরজা খুলে সামনের সীটে বসলেন। তাঁকে ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। পায়ের কাছে রাখা ছোট্ট ব্যাগ থেকে হুইস্কির বোতল বের করে ওয়াটার বট্‌ল্ থেকে গ্লাসে জল ঢেলে মেশালেন। তারপর চুমুক দিলেন।

কুমারকে বললেন, খাবে নাকি?

কুমার নিস্পৃহ গলায় বলল, আ-স্মল ওয়ান্।

বলেই আবার বলল, কাছাকাছি নিশ্চয়ই গ্রাম-টাম থাকবে। আপনারা বসুন। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আসি।

সান্যাল সাহেব বললেন, তা কি হয়? এই জংলী জায়গায়, অচেনা অজানা পরিবেশ—একা যাবে কেন?

কুমার বলল, এইরকম জায়গা বলেই বলছি। মহুয়াকে

সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে এমন জায়গায় কি ঘুরে বেড়ানো সেফ? তারপর ডাকাতির কথা তো শুনলেন।

সান্যাল সাহেবের গলার স্বরে কেমন এক শুষ্ক বিরক্তি ও রাগ ঝরে পড়ল! বললেন, কী করা উচিত তুমিই বলো— কী করাটা সেফ?

ইতিমধ্যে পিছন থেকে একটি আগন্তুক জীপের শব্দ শোনা গেল। অসমান প্রস্তরাকীর্ণ লাল ধূলি-ধূসরিত পথে জীপের উঁচু হেডলাইটের আলোটা লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছিল।

হঠাৎ কুমার বলল, মহুয়া, তুমি নীচু করে বসে পড়ো। তোমাকে যেন দেখা না যায়।

মহুয়া বলল, আপনারা থাকতে আমার ভয় কি?

কুমারের গলায় ভয়। বলল, যা বলছি করো। তর্ক করো না। লিসন্ টু মী।

মহুয়া ভয় এবং বিরক্তিসূচক একটা সংক্ষিপ্ত চ-কারান্ত শব্দ করে সীটের নীচে আধশোয়া ভঙ্গীতে বসে পড়ল।

সান্যাল সাহেব পাইপ কড়মড় করে বললেন, বন্দুকটা আনার কথা বললাম; তাও আনতে দিলে না তুমি। তুমি···রিয়্যালি···।

জীপটা যত কাছে আসছিল ততই যেন গতি কমে আসছিল— এবং মহুয়ার গলার কাছে কী একটা অননুভূতি অনুভূতি দলা পাকিয়ে উঠেছিল। ওর প্যারিসে-থাকা মায়ের কথা মনে পড়ল ওর—আরো অনেক কথা। হঠাৎ।

কুমার তাড়াতাড়ি জানালার কাঁচটা তুলে দিল। একটা সিগারেট ধরাতে গেল। কিন্তু পারল না। ওর কাঁপা-হাতে দেশলাইটা জ্বালাতে পারল না। একবার যদিও বা জ্বালল, পরক্ষণেই জ্বলন্ত কাঠিটা গাড়ির মধ্যেই হাত থেকে পড়ে গেল।

মহুয়া ফিস্‌ফিস্ করে বলল, কী করছেন! আগুন লাগাবেন নাকি?

সান্যাল সাহেব কুমারের দিকে এবার ঘৃণার চোখে তাকালেন। তারপর হঠাৎ বাঁ দিকের দরজা খুলে নেমে পড়ে রাস্তার পাশে এসে সাহসের সঙ্গে গাড়ির গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

চলন্ত জীপের মধ্যে হিন্দীতে অনেক লোক কথা বলছিল।

কারা যেন হাসছিল। এমন সহজ শিকার পেয়েছে দেখে বুঝি ওদের আনন্দের সীমা ছিল না।

সান্যাল সাহেব হাত তুললেন।

জীপের ইঞ্জিনটা ওদের গাড়ির ঠিক পিছনে এসেই যেন বন্ধ হয়ে গেল। প্রথমে মনে হল বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই মহুয়া বুঝল বন্ধ হয়নি—গাড়িটা থেমে গেছে। কিন্তু ইঞ্জিনের ধক্‌ধক্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দু'পাশ থেকে একসঙ্গে চার-পাঁচজন লোকের লাফিয়ে নামার শব্দ শুনল মহুয়া। কুমারের সাড়াশব্দ পেল না। মনে হল ভয়ে ও গাড়ির মধ্যে জমে গেছে। মরেই গেল বুঝি-বা।

বাবার গলা শুনতে পেল মহুয়া। বাবা পাইপটা ধরিয়ে শুধু হাতে, বিপদের মুখে, শুধুমাত্র গলার স্বররে যতখানি ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করা যায় তা করে বললেন, হিঁয়া কোই মেকানিক মিলেগা ? গাড়ি জারা খারাপ হো গয়া।

ডাকাতদের মধ্যে একজন অডাকাতসুলভ অত্যন্ত ভদ্র গলায় বাংলায় বলল, আপনারা বাঙালী—কোলকাতার নম্বর দেখেই বুঝেছিলাম। কী, হয়েছে কী ?

গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে। এখানে মিস্ত্রী-টিস্ত্রী পাওয়া যাবে ?

ওঁদের মধ্যে থেকে একজন বললেন, এই পাহাড়টা পেরিয়েই ওপাশে ফুলটুলিয়া গ্রাম। সুখন মিস্ত্রীর একটা কারখানা মতো আছে।

ওঁদেরই মধ্যে আরেকজন বললেন, সুখন মিস্ত্রী কে রে ?

প্রথম ভদ্রলোক বললেন, আরে দুখন মিস্ত্রীর ভাই। দুখন মারা গেছে তো মাসখানেক হল। ওর ভাই সুখন এসে কারখানা জিম্মা নিয়েছে।

সান্যাল সাহেব বললেন, আমাদের মধ্যে কেউ কি একটু যেতে পারি আপনাদের সঙ্গে কারখানা অবধি ?

ওঁরা সমস্বরে বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

ইতিমধ্যে মহুয়া সীটের তলা থেকে শরীর বের করে সীটের উপরে বসেছে আস্তে আস্তে। যারা ডাকাত নয়, তাদের কাছে অমন লুকিয়ে থাকা অবস্থায় ধরা পড়তে চায়নি ও।

মহুয়া ভেতর থেকে ডাকল বাবা !

নারীকণ্ঠ শুনে জীপের আরোহীরা অবাক গলায় বললেন, সঙ্গে মেয়েছেলে আছে নাকি? তাহলে তো মুশকিল করলেন। তাহলে আপনারা সকলেই থাকুন এখানে—আমরা গিয়েই সুখনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আরেকটা কাজ করা যায়। আমরা টো করে নিয়ে যেতে পারি আপনাদের গাড়ি। কিন্তু আমাদের কাছে দড়ি নেই। আপনাদের কি আছে?

কুমার এতক্ষণে নেমেছে গাড়ি থেকে। নেমে বলল, নেই।

সান্যাল সাহেব বললেন, কী আছে তোমার সঙ্গে? কিছুই না নিয়ে এত লম্বা পথে বেরিয়েছ?

মহুয়া মনে মনে বলল, গলায় দড়ি দেওয়ার জন্যও তো কিছুটা আনা উচিত ছিল।

কী করা হবে এই নিয়ে সান্যাল সাহেব ও কুমার ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলছেন। এমন সময় পাহাড়ের উপরের রাস্তা থেকে একটা আশ্চর্য উদ্ভট আওয়াজ কানে এল। চোখে পড়ল একটা স্তিমিত এবং কম্পমান ঘূর্ণায়মান আলো।

ওঁরা সকলেই ওদিকে তাকালেন।

হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে বললেন, অন্যজনকে, আরে এ তো সুখনের গাড়ি।

তারপর সান্যাল সাহেবের দিকে ঘুরে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, পর্বতই চলে আসছে মহম্মদের কাছে। বলেই কুমারের দিকে ঘুরে বললেন, যান মশাই, আর ভয় নেই। সুখনকে ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন ঠিক সময়মতো।

যে যন্ত্রটা পাহাড় বেয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে, সেটাকে গাড়ি বলে ভুল করার কোনো কারণ নেই। একটা নড়বড়ে ধাতব ব্যাপার টুং-টাং-ঠিন্-ঠিন্-টকা-টক্-ঝকা-ঝং আওয়াজ করতে করতে লাফাতে-থাকা ঘুরন্ত মিটমিটে একটা-মাত্র হেডলাইট নিয়ে পাহাড় বেয়ে অন্য কোনো গ্রহের এক কিম্ভুতকিমাকার অদৃশ্যপূর্ব জন্তু যেন হামাগুড়ি দিয়ে নামছে পাহাড় থেকে।

সকলেই সেদিকে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। এমনকি জীপের আরোহীরাও। এঁরা বোধহয় সুখন মিস্ত্রির এই গাড়িটাকে

দিনমানে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই দেখে থাকবেন এতদিন। রাতের অন্ধকারে তার চলন্ত রূপটি দেখে তারা সকলেই বিস্ময়বিমূঢ় এবং চলচ্ছক্তিহীন হয়ে গেছেন।

গাড়িটা যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই তার আওয়াজ বাড়তে লাগল। এতক্ষণ অর্কেস্ট্রার দূরাগত ঐক্যতান শোনা যাচ্ছিল। এখন কাছে আসায় বিভিন্ন যন্ত্রবিশেষের বিভিন্ন আওয়াজ আলাদা আলাদা হয়ে কানে লাগছে।

পথের মধ্যে দু-দুটো গাড়ি ও এত লোকজন দেখে বোধহয় সুখন মিস্ত্রী হর্ন বাজাল।

সেই চন্দ্রালোকিত হলুদ বাসন্তী রাতে যাবৎ জীবন্ত পশুপাখি, কীটপতঙ্গ মায় সমবেত জনমণ্ডলীর হৃৎপিণ্ড চমকিয়ে দিয়ে সেই যন্ত্রযান একটি প্রাগৈতিহাসিক মোরগের মত ডেকে উঠল— কঁরর -- র-র-র্। আবার ডাকল, ক'-ক'র-ক'র র্-র্-র্।

এরা সকলে হৈ-চৈ করে উঠল। প্রায় চিৎকার করেই থামাল যন্ত্রটাকে।

ইঞ্জিনটার সঙ্গে এক-চোখা আলোটাও মাথা দোলাতে দোলাতে এসে ওদের সামনে থেমে গেল। ঘটাং শব্দ করে ব্রেক কষে দাঁড় করাল ড্রাইভার গাড়িটাকে।

সুখন, এ সুখন বলে জীপের আরোহীদের মধ্যে কে যেন ডাকল।

সীটের উপরে একটা তাকিয়া রেখে তার উপর বসে গাড়ি চালাচ্ছিল কালো হাফ-প্যাণ্ট ও লাল-গেঞ্জি পরা একটি বছর বারো-তেরোর বেঁটে-খাটো কালো-কালো ছেলে। সে গুড়গুড়িয়ে নেমে এসে বলল, হুয়া কা?

জানা গেল ও সুখন নয়, সুখনের খিদমদগার। গাড়ি নিয়ে সুখনের জন্য গুঞ্জা বস্তীতে যাচ্ছিল মহুয়ার মদ আনতে। সুখন কারখানা সংলগ্ন তার বাড়িতেই আছে।

মহুয়ার মদের কথা শুনে সান্যাল সাহেব চিন্তিত হলেন ও কুমার আঁতকে উঠল।

জীপের আরোহীদের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন ওঁরা দুজনেই। বোধহয় সুখন মিস্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে নীরব প্রশ্ন করলেন।

তাঁদের মধ্যে যিনি নেতা-গোছের, তিনি বললেন, আরে নে—হী। মহুয়া তো হিঁয়া সব কোই-ই পীতা। সুখন বড়া আচ্ছা আদ্‌মী। আপলোগ বেফিক্কর রহিয়ে। অ্যায়সা কুছ দুগ্‌গী-তিগ্‌গী আদ্‌মী নহী হ্যায়। উও বড়েখানদানকে পড়ে-লিখে আদ্‌মী— আভি পেট্‌কা লিয়ে গাড়ি মেরামতীকা কামমে লাগা হুয়া হ্যায়।

তারপর বললেন, কইভী ডর নেহী। আপলোগ ইতিমান্‌-সে যানে সকতা।

॥ দুই ॥

কখন ওরা সুখন মিস্ত্রীর কারখানায় পেঁীছেছিল কখনই-বা কারখানার লাগোয়া সুখেনের বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিল খিঁচুড়ি খাওয়ার পর, আর কখনই-বা রাত পেরিয়েছিল মনে নেই মহুয়ার।

এদিকে কাছাকাছি কোনো ডাকবাংলো-টাকবাংলো নেই। একটা ছিল ; সেটা নাকি দশ মাইল দূরে। এতখানি আসার পর আর কোথাও যাবার মত অবস্থা ছিল না কারোই। তাই বাবা এবং কুমার ডিসাইড করেছিলেন যে এখানেই রাত কাটাবেন।

টালির ছাদ উপরে। সীলিং-টিলিং নেই। টালির ফাঁক-ফোঁক দিয়ে আলো চুঁইয়ে এসে ঘরে পড়েছে।

দেওয়ালের দিকের চৌপাইয়ে মহুয়া শুয়েছিল। মধ্যের চৌপাইতে বাবা, ওপাশে কুমার। শেষ রাতে বেশ শীত-শীত করছিল। চাদর মুড়ে শুয়ে মহুয়া আলস্যে পড়ে থাকল অনেকক্ষণ। আড়মোড়া ভাঙল।

কুমারের শোয়াটা বিচ্ছিরি। তাছাড়া অমন ছিপছিপে চেহারার লোক যে অমন নাক ডাকাতে পারে এ-কথা মহুয়ার জানা ছিল না। কুমারের দিকে তাকিয়ে এক বিষণ্ণ হতাশায় ওর মন ভরে এল।

মহুয়া উঠল। শাড়িটা ঠিক করল। তারপর দরজা খুলে বারান্দায় এল। বারান্দায় আসতে দেখল, কাল রাতের সেই যন্ত্রযানচালক-কাম্-তাড়াতাড়ি খিচুড়ি রেঁধে-দেওয়া মংলু যেন তারই অপেক্ষায় বসে আছে।

মংলু বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসেছিল। মহুয়াকে দেখেই বলল, চা করব দিদিমণি ?

মহুয়া বলল, করো ; কিন্তু এক কাপ। ওঁরা এখনও ওঠেননি।

তারপর বলল, তোমার বাবু কোথায় ?

মংলু বলল, কে ? ওস্তাদ ? ওস্তাদ তো কারখানায়। গাড়ি নিয়ে পড়েছেন। আপনাদেরই গাড়ি।

বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বারান্দার মোড়ায় বসে চা খেল মহুয়া।

শেষ রাত থেকেই কী একটা চাপা আনামা খুশিতে ওর মন ভরে রয়েছে। ভেতরে একটা ছটফটে কষ্ট। কষ্ট মানেঃ আনন্দ।

বাবা এবং কুমার যে এখানে রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেজন্য ওঁদের দুজনের কাছেই মহুয়া খুব কৃতজ্ঞ।

বারান্দা ঘেঁষে থামের গায়ে পর-পর নানারঙা বোগেনভোলিয়া লতা। মেরী পামার ও আরো অনেকরকম ফুলে-ফুলে ছেয়ে আছে। তার মধ্যে একটা নিমগাছ। কোণায় একটা কুয়ো — লাটাখাম্বা লাগানো আছে। এপাশে-ওপাশে ছড়ানো-ছিটোনা মবিলের টিন, টায়ার-টিউব, নানারকম গাড়ির মরচে পড়া রিম্। একটা ম্যাটমেটে লালরঙা পুরনো ভাঙাচোরা চাকাহীন গাড়ি মাটিতে বুক দিয়ে বসে আছে।

বারান্দায় বসে সে উদ্দেশ্যহীনভাবে তাকিয়ে এই সকালে একা-একা চা খেতে ভারী ভাল লাগছিল মহুয়ার। অনতিদূরে শালবন থেকে কোকিল ডাকছে শিহরন তুলে। অন্য দিক থেকে সাড়া দিচ্ছে অন্য কোকিল। তখন হিম্-হিম্ ভাব। পলাশে শিমুলে দূরের লাল এবড়ো-খেবড়ো প্রান্তর ভরে আছে। এই ভোরের সমস্ত সত্তা ভোরে রয়েছে কি-যেন কি ফুলের উগ্র গন্ধে। চতুর্দিক ম' ম' করছে।

নাক দিয়ে জোরে হাওয়া টানল মহুয়া।

মংলুকে শুধোল, কিসের গন্ধ এ? কোন্ ফুলের?

মংলু অবাক চোখে তাকাল মহুয়ার দিকে।

মহুয়া বুঝতে পারছিল মংলুর মুখ-চোখ দেখে যে, জীবনে মহুয়ার মত কখনো কারো খিদ্মদ্গারি করতে পারার এত সৌভাগ্য যে আসবে, তা বোধহয় ও কখনও ভাবেনি। তাই মহুয়াকে কোথায় বসাবে, কী খাওয়াবে ভেবেই পাচ্ছে না মংলু।

মহুয়ার প্রশ্নে অবাক চোখে তাকাল ও। এই অপাব অজ্ঞানতায় আশ্চর্য হয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বলল, এ তো মহুয়ার গন্ধ!

মহুয়ার লজ্জা পাওয়ার কথা ছিল না। তবুও ও লজ্জা পেল; ওর ভালও লাগল। ওর নামের ফুলে-ফলে যে এমন মাতাল-করা গন্ধ তা বুঝি ও নিজে এখানে না এলে জানতে পেত না। নিজেকে ভালবাসতে ইচ্ছে করল।

বারান্দার ওপাশে আর একটা ঘর। দরজা খোলা রয়েছে হাঁ করে।

মহুয়া শুধোল, এটা কার ঘর?

ওস্তাদের। মংলু বলল।

তুমিই ওস্তাদের রান্না করে দাও?

মংলু হাসল।

বলল, ওস্তাদ কিছুই খেতে চায় না। রাঁধব আর কি? কার জন্য? সারাদিন কাজ করে, তারপর সন্ধ্যের পর যা-হয় দুজনে কিছু ফুটিয়ে নিই।

মহুয়া শুধোল, কেন? দুপুরে কিছু খাও না তোমরা?

আমি খাই। পাঁড়েজীর দোকানে গিয়ে পুরী, আলুর তরকারি এসব খেয়ে আসি। রান্না করি না কিছু। একার জন্য কে ঝামেলা করে? ওস্তাদ তো কিছুই খায় না। চা আর পান আর একশো বিশ জর্দা—ব্যাস্। সারাদিনে ঐ।

কাল রাতেই বিহারী-নামের এই বাঙালী লোকটাকে দেখা অবধি মহুয়ার যেন কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে ভেতরে। এমন প্রচণ্ড গোলমাল ওর অন্তর্জগতে এবং হয়তো শরীর-জগতেও আগে কখনও ও অনুভব করেনি। লম্বা, রোদে-পোড়া সবল

চেহারা। জুলপির চুলে একটু পাক ধরেছে। শক্ত চোয়াল। কথা কম বলে—চোখ দুটোতে এক স্তব্ধ ঔজ্জ্বল্য—কিন্তু সব মিলিয়ে এই সুখন মিস্ত্রীকে প্রথম দেখার পরই এমন কিছু ঘটে গেছে মহুয়ার ভেতরে যে, তাদের গাড়ির মত তার মনেরও বুঝি মেরামতির বড় দরকার হয়ে পড়েছে এখুনি।

এ-কথা ও কাউকে বলতে পারেনি। পারবেও না। মহুয়া এই মিস্ত্রীকে স্বপ্ন দেখেছে রাত্রে। এক ঝলক দেখেছে। ঘুমের মধ্যে এক দারুণ ভাললাগায় ও ভরে গেছে। কেন ও জানে না। আজ এই স্পষ্ট ভোরেও অস্পষ্টতায় ভরা রাতে-দেখা এবং স্বপ্নে-দেখা সুখন মিস্ত্রী তার সমস্ত সত্তায় একটা অদ্ভুত সুখময় আভাস রেখে গেছে। আভাসটা কোন্ সত্যের, মহুয়া এখনও বুঝে উঠতে পারছে না।

শেষে কিনা পালামৌর একটা অখ্যাত গ্রামের এক মোটরমিস্ত্রী! কিন্তু তাই কি?

নাঃ। নিজেই নিজেকে বকল মহুয়া। বলল—ওর রুচি বড় খারাপ হয়ে গেছে। বলল, নিজেকে সংযত করো। এ-সব ভাল নয়।

মংলু বলল, দিদিমণি, আর একটু চা খাবেন?

মহুয়া বলল, করো।

বলতেই মংলু ঘর ছেড়ে রান্নাঘরে গেল। যেতে যেতে বলল, নাস্তার বন্দোবস্ত করে রেখেছি। ওস্তাদ সূর্য ওঠার আগেই নিজে গুঞ্জা বস্তীতে গিয়ে আপনাদের জন্য আনাজ, ডিম, মুরগী সব নিয়ে এসেছে। এখানে তো মাছ পাওয়া যায় না। যখনি বলবেন পরোটা, আলুভাজা, ডিমের তরকারি বানিয়ে দেবো। ওস্তাদ বলেছেন, আপনাদের কোনোরকম কষ্ট হলে আমার চাকরি যাবে। দুপুরে মুরগীর ঝোল, বাইগন্‌কা ভাত্তা, পুদিনার চাট্‌নি, কাঁচা আম আর লঙ্কা বাটা; আর সবশেষে গুঞ্জার প্যাঁড়া। আপনি শুধু বলবেন, কখন কী খাবেন!

মহুয়া বলল, কেন? গাড়ি সারাতে কি খুব দেরি হবে? গাড়ির কি হয়েছে আগে সেটাই জানা যাক।

বিকেলের আগে নিশ্চয়ই হবে না। চিন্তা করবেন না দিদিমণি। ওস্তাদ সময়মত ঠিকই জানাবে।—মংলু বলল।

মহুয়া একবার ঘরের মধ্যে তাকাল। দেখল বাবা ও কুমার এখনও ঘুমিয়ে কাদা। রাতে হুইস্কীটা বেশি খেয়েছেন দুজনেই। তার উপর বিপদ থেকে ত্রাণের আরাম বোধহয় ঘুমের ওষুধের কাজ করেছে ওদের স্নায়ুতে।

চা-টা খেয়ে মহুয়া একবার ঘরে গেল। ঘরের দেওয়ালে একটা আয়না ছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটু দেখে নিল। চুলটা ঠিক করে নিল। বাথরুমে গিয়ে কালকের সারাদিনে পরা শাড়িটা ছেড়ে একটা কালো আর লাল ডুরে পাছাপেড়ে শান্তিপুরী শাড়ি পরল। একটু আলতো করে কাজল লাগাল চোখে। মহুয়া জানে যে, মহুয়ার চোখ দুটো ভারী সুন্দর। ও-যে সুন্দর, ওকে দেখে যে অনেক পুরুষ আত্মহারা হয়, এ-জানাটা ও ফ্রক-পরা বয়স থেকেই জেনেছে। কিন্তু কাল রাতের লণ্ঠনের আলোয় হঠাৎ যে-লোকটিকে দেখেছিল—সেই লোকটির মতো কাউকে নিজে এর আগে ও দেখেনি। ও-যে নিজেও কাউকে দেখে আত্মহারা হতে পারে—লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট বলে একটা সুতীব্র বেদনাময় অনুভূতি যে তার জীবনেও সত্যি হবে এই এতদিন পরে, ও কখনই তা ভাবেনি। ওর ভেতরে যে একটা ভীষণ দামী আসল-আমি ছিল, সেই আমি-টাকে—সেই মুখটি, সেই ব্যক্তিত্বটি বড় চমক তুলে ডাক দিয়েছে। ওর হৃদয়ের গভীরে কেউই আর এমন করে পথ কাটেনি আগে।

অথচ আশ্চর্য! কেমন করে কী হয়ে গেল, হয়ে গেছে, ও জানে না। ওর শরীরের জোর পাচ্ছে না। এই বাসন্তী সকালের কোকিলের ডাকে, মহুয়া আর শালফুলের গন্ধে, এই অলস হাওয়ায়, অনতিদূরের জঙ্গলের মধ্যে চরে বেড়ানো মোষের গলার কাঠের ঘন্টার গম্ভীর ডুং ডুং শব্দে ও নিজেকে সম্পূর্ণ খুইয়ে ফেলেছে। ওর সব গর্ব, সব অহংকার, সব কিছুই বুঝি এই ফুলটুলিয়ার ধুলোয় ফেলা গেল।

মহুয়া বাইরে গেল। তারপর ওঁরা ওঠার পর ওঁদের চা দেওয়ার জন্য মংলুকে বলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে কারখানার দিকে পা বাড়াল।

পাশেই কারখানা। মধ্যে সরু সরু বাঁশ পুঁতে একটা বেড়ার মত দেওয়া। বেড়ার উপর ওদেরই গাড়ির কার্পেট পাপোষ, সব রোদে দেওয়া হয়েছে।

কারখানায় ঢুকে মহুয়া দেখল, ওদের গাড়ির বনেটটা তোলা। ভদ্রলোক মাথা নামিয়ে কী যেন ঠুক-ঠাক করছেন। কাল রাতে-পরা খয়েরী-রঙা জিনের প্যাণ্ট—পায়ে টায়ার-সোলের চটি। ঝুঁকে-পড়া সবল সুগঠিত পা ও পেছনের আভাস, সুন্দর বলিষ্ঠ হাতের কনুই অবধি দেখা যাচ্ছে। মুখ নামিয়ে ইঞ্জিনের গভীরে কী যেন দেখছেন, যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করছেন। আর পায়ের কাছে মাটিতে লেজ গুটিয়ে বসে আছে একটা কালো নেড়ি কুকুর। এই পরিবেশে কুরকুরটি অদ্ভুত মানিয়ে গেছে।

লক্ষ্য করে দেখল মহুয়া যে কুকুরটার পিছনের একটা পা ভাঙা।

মহুয়া কথা না বলে একটা খালি মবিলের ড্রামে হেলান দিয়ে মানুষটিকে দেখতে লাগল নিমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে। নামটা বাজে—সুখন।

ওর অস্তিত্ব টের পায়নি সুখন?

এত সকালে কারখানায় অবশ্য কেউ আসেনি। নিমগাছে কাক ডাকছে, দূরের বনে কোকিল। ঝিরঝিরে হাওয়ায় কারখানার তেল-মবিলের গন্ধ ছাপিয়ে শালফুলের, মহুয়া ফুলের ও আরো কত কিছুর বনজ গন্ধ ভাসছে।

কুকুরটা একদৃষ্টে দেখছিল মহুয়াকে। ঈর্ষাকাতর চোখে চেয়েছিল। কুকুরটা বোধহয় মেয়ে। মহুয়ার প্রতি মনোভাবটা ঠিক কি রকম হওয়া উচিত তা ঠিক করে উঠতে পারছিল না বুঝি।

কিছুক্ষণ পর কুকুরটা হঠাৎ ভু-উক্ ভুক্-ভুক্-ভুঃ করে ডেকে তিন-পায়ে নড়বড়ে তে-পায়ার মত দাঁড়িয়ে উঠল। উঠেই ছুঁচলো মুখে কান খাড়া করে মহুয়ার দিকে চেয়ে ক্রমান্বয়ে ডাকতে লাগল।

সুখন মুখ না তুলেই বলল, 'আঃ কালুয়া, চুপ কর্।'

তাতেও যখন কালুয়া চুপ করল না তখন সুখন মুখ তুলল। মুখ তুলেই মহুয়াকে দেখে অবাক হল। একটা অপ্রতিরোধ্য ভাললাগা এসে তার মুখের রঙ বদলে দিল। পরক্ষণেই সামলে নিল সুখন নিজেকে। সুখন মিস্ত্রী—নিজের কারখানার পটভূমিতে ফিরিয়ে আনল নিজেকে। নিজেকে মনে মনে চাবকাল।

কালিমাখা দু'হাত তুলে নমস্কার করল। বলল নমস্কার।

সুখনের বাঁ গালে অনেকখানি কালি লেগেছিল। ওর চওড়া চোয়াল, ছোট ছোট করে ছাঁটা খেলোয়াড়দের মত চুল, উদ্ধত চিবুক, বুক-খোলা গেঞ্জীর মধ্যে দিয়ে দেখা-যাওয়া চওড়া বুকের একরাশ কোঁকড়া চুল—এ-সব মহুয়া এক নিমেষে দেখে নিল। দেখে ভাল লাগল। শুধু ভালই নয়, কেমন যেন গা শিরু-শিরু করে উঠল ওর। সে অনুভূতিটা যে কেমন, তা শুধু মেয়েরাই জানে, বোঝে। এই শিরুশিরানি-তোলা একান্ত মেয়েলি অনুভূতি কোনো পুরুষের পক্ষে কখনও বোঝা সম্ভব নয়।

অনেকক্ষণ পরে যেন ঘোর কাটার পর মহুয়া বলল, নমস্কার। তারপর একটু দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল, আমার নাম মহুয়া।

সুখন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। কী বলবে ভেবে পেল না। সুখন জীবনে এই প্রথমবার অপ্রতিভ বোধ করল। ও যে এমন ক্যাবলা হয়ে যেতে পারে তা কখনও জানেনি আগে; বিশ্বাস করেনি।

সুখন নীচু গলায় প্রায় স্বগতোক্তির মতই বলল, এখন তো বসন্তের দিন। এই-ই তো সময় মহুয়ার। গন্ধ পাচ্ছেন না বাতাসে?

আপনি?

মহুয়া জবাব না দিয়ে উল্টে প্রশ্ন করে দু' চোখ তুলে পূর্ণ দৃষ্টিতে সুখনের দিকে তাকাল।

সুখন বলল, পাচ্ছি। সবসময়ই পাই। মহুয়ার আমি ভীষণ ভক্ত—মহুয়া ফুলের।

আর মহুয়ার মদের না?—বলেই মহুয়া হেসে উঠল।

সুখনও হাসল।

সুখনের হাসি মিলানোর আগেই মহুয়া বলল, আমি কিন্তু মদও নই, ফুলও নই। শুধুই মহুয়া।

সুখন পাশ ফিরে একটা রেঞ্জ হাতে নিয়ে বলল, মদ খাই না তা নয়; আমরা মিস্ত্রী-মজদুর লোক। তবে মদের চেয়ে ফুলই ভাল লাগে আমার।

পরক্ষণেই রক্ষীহীন একজন অপরিচিতা. সুন্দরী ভদ্রমহিলার

সঙ্গে মোটর মেকানিকের এতখানি অন্তরঙ্গতা ঠিক হচ্ছে কি না ভেবে নিয়েই সুখন গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, আপনি রাগ করলেন তো ? আমি কোথায় কী কথা বলতে হয় ঠিক জানি না। দোষ করে থাকলে মাফ করে দেবেন।

মহুয়া কথার জবাব না দিয়ে বারান্দায় একটা কাঠের বাক্সে অনেকগুলো গোল গোল চক্‌চকে বল-বেয়ারিং পড়েছিল সেদিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আমি একটা নিতে পারি ?

নিন না। কিন্তু কী করবেন ? অবাক হয়ে শুধোল সুখন।

কিছু না। 'এমনিই স্টীলের তৈরি না ? দেখতে একেবারে মার্বেলের মত। আচ্ছা আমি কি দুটো নিতে পারি ?

নিন না, আপনার যতগুলো ইচ্ছে নিন। বলেই হেসে ফেলল সুখন।

মহুয়া দুটো গোলাকৃতি বল তুলতে তুলতে বলল, আপনি খুব দিলদরাজের লোক তো।

কথার জবাব দিল না সুখন।

সুখন মনে মনে একটু ভয় পেতে আরম্ভ করেছে।

কুমার ভদ্রলোককে ওর মোটেই ভাল লাগেনি। টিপিক্যাল শহুরে চালিয়াত। ক্লাস-কনশাস্‌। এ-লোকগুলোই দেশের অন্য ভাল লোকগুলোরও সর্বনাশ করে দিল। কুমার কতখানি উদার সে সম্বন্ধে সুখনের সন্দেহ ছিল। মহুয়াকে সুখনের সঙ্গে একা দেখে যদি সুখনকে কিছু বলে সে আকারে-ইঙ্গিতেও, তাহলে সুখন কিন্তু ঘুষি-টুষি মেরে দেবে। যেদিন ভদ্রলোক ছিল, ছিল। আজ আর সে ভদ্রলোক নেই। ভদ্রলোকদের কারো কাছেই সে ভদ্রলোকী পায় না ; হয়তো আজ চায়ও না। তাই ছোটলোকী কায়দায় কথায় কথায় ঘুষি চালাতেও ওর আজকাল একটুও দেরি হয় না। সহ্যশক্তি, পরিণামজ্ঞান, সভ্যতা-জ্ঞান ওর আর নেই বললেই চলে। ও নিজেকে আর ভদ্রলোক ভাবেনা। ভদ্রলোক হবার ইচ্ছাও আর ওর নেই।

সুখন এড়িয়ে গিয়ে বলল, আমি হলাম একজন সামান্য মিস্ত্রী। দরাজদিল থাকলেও বা তা দেখাবার সামর্থ কোথায় ?

তারপর কথা ঘোরাবার জন্য বলল, আপনি চা-টা খেয়েছেন ?

খেয়েছি।—মহুয়া বলল।

তারপর বলল, আপনি চা খাবেন না? সকালে কি চা খেয়েছেন? আমি নিয়ে আসব? শুনলাম, চা আর জর্দা পানই নাকি আপনার প্রধান খাদ্য-পানীয়?

সুখন অবাক হল; বলল, কে বলল? মংলু বুঝি?

বললেন না তো চা খাবেন কিনা? মহুয়া বলল।

না, না থাক, আপনি মাথা ঘামাবেন না। একটু পরে মংলুই নিয়ে আসবে। ও জানে। একবার তো খেয়েছি।

আহা, আজ না হয় আমিই আনলাম? আমাদের গাড়ি সারাচ্ছেন এত কষ্ট করে গালে কালি লাগিয়ে—আমি···।

ওকে থামিয়ে দিয়ে সুখন বলল, কষ্ট কি? এ তো আমার কাজ। এই তো রুজি। কাজ হয়ে গেলে টাকা দেবেন না বুঝি? টাকাও দেবেন—আবাব এত ভাল ব্যবহারও করবেন, এটা ঠিক নিয়ম হচ্ছে না।

মহুয়া বলল, ওসব কথা আমার সঙ্গে নয়। এটা কুমারবাবুর গাড়ি। এ ব্যাপারটা তাঁর। আমি জাস্ট প্যাসেঞ্জার।

একটু থেমে মহুয়া আবার বলল, কি? খাবেন কিনা বলুন? নাকি আমার হাতে খাবেন না? আমি কিন্তু ব্রাহ্মণের মেয়ে। বাবার পদবী যখন সান্যাল। বোঝা উচিত ছিল।

সর্বনাশ করেছে। আপনারা বারেন্দ্র নাকি? আমার তো খেয়ালই হয়নি! বলেই হেসে ফেলল সুখন।

মহুয়াও হেসে উঠল হোঃ হোঃ করে। বলল, আমাদের এত গুণ যে পুরো বাংলাদেশের লোক আমাদের এঁটে উঠতে পারল না বলেই মেনেও নিতে পারল না—তাই-ই তো সকলে পিছনে লাগে।

শুধু গুণ কেন? রূপও আছে।—সুখন বলল।

কথাটা বলেই সুখন মুখ নামিয়ে নিল। নিজেই লজ্জা পেল বলে ফেলে।

মহুয়াও উচ্ছলতার মধ্যে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর চটির মধ্যে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ঘষতে ঘষতে বলল, আহা! কী রূপ!

নিমগাছের মগডালে হঠাৎই কাকেদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল ওরা উড়ে-উড়ে ঘুরে-ঘুরে, কা-খুবা-কা-খুবা-খুবা-কা করে ভোরের সমস্ত শান্তি, নির্লিপ্তি, সমস্ত আমেজটুকু নষ্ট করে দিল।

মহুয়া আর সুখন দুজনেই একই সঙ্গে নিমগাছের দিকে তাকাল। দেখল একটা ছিপছিপে মেয়ে-কাককে নিয়ে দুটো কর্কশ পুরুষ কাকের মধ্যে ভীষণ লড়াই বেঁধেছে। আর সমবেত কাক মন্ডলী দু'দলে ভাগ হয়ে গিয়ে দুই লড়িয়েকে চিৎকার করে মদত দিচ্ছে।

সুখন একটা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল উপরে। মুহূর্তের মধ্যে সব কাক নিমগাছ ছেড়ে উড়ে চলে গেল। কিন্তু রয়ে গেল শুধু সেই মেয়ে কাকটা। ও নড়ল না। ডালে বসে মসৃণ ছাই-ছাই গ্রীবা বেঁকিয়ে লাল পুঁতির মত চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একবার এ-কোটরে আরেকবার ও-কোটরে এসে কত কী ভাবতে লাগল।

কিছুক্ষণ উপরে তাকিয়ে থেকে সুখন স্বগতোক্তির মত বলল, এবার আপনি বাড়ি যান। মিস্ত্রী-টিস্ত্রীরা এক্ষুণি এসে পড়বে। চিৎকার, চেঁচামেচি, আওয়াজ, গালিগালাজ—এর মধ্যে থাকতে নেই। গিয়ে ভাল করে চান-টান করে নাস্তা করুন। বেলা হলে কুয়োর জল গরম হয়ে যাবে। মংলুকে বলবেন, আরো জল লাগলে কুয়ো থেকে বাথরুমে এনে দেবে।

মহুয়া কপট রাগের গলায় বলল, আপনি তাহলে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

সুখন বলল, আপনি আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করলে গাড়ি সারাতেই আমার দেরি হবে। কারিগরীটা এখনও রপ্ত হয়নি যে।

তারপর একটু থেমে বলল, আপনারা তো বেতলা যাবেন; তাই না? বেতলা যাবার জন্যই তো কোলকাতা থেকে বেরিয়েছেন। এইখানে দেরি ও কষ্ট করবার জন্য তো আসেননি? প্লিজ যান। আরাম করুন গিয়ে।

ফিরে আসতে আসতে ও মনে মনে বলছিল যে, এত তাড়া কেন তোমার, আমাকে তাড়াবার? চলে তো আমরা যাবই। থাকার জন্য তা আসিনি! তবু গাড়িটা এক্ষুণি না-সারালেই কি নয়? গাড়ি সারাতে সময়ও তো লাগতে পারত।

মনের মধ্যে একটা চাপা কষ্ট, প্রচ্ছন্ন অভিমান, অস্বস্তিকর এক অপমানবোধ নিয়ে মহুয়া ধীর পায়ে ফিরে এল ডেরায়। ওরা তখনও ঘুমোচ্ছিলেন।

ডেরাটা চুপচাপ। মংলু বারান্দায় বসে তরকারি কাটছিল।

বারান্দায় একটা ঠাণ্ডা ভাব। ঝির্‌ঝির্‌ করে প্রভাতী হাওয়া বইছে।

মহুয়াকে আসতে দেখে হঠাৎই মংলু বলল, দিদিমণি, ওস্তাদের ঘর দেখবে?

কি হবে?

উদাসীনতার গলায় বলল মহুয়া। মনে মনে বলল, লাভ কি অপরিচিত লোকের ঘর দেখে? পরক্ষণেই পরম অনিচ্ছা-সহকারে বলল, আচ্ছা চলো দেখি।

কিন্তু সুখন মিস্ত্রীর ঘরে মংলুর সঙ্গে ঢুকেই মহুয়া অবাক হয়ে গেল।

বইয়ে-বইয়ে ভরা ঘরটা। সব জায়গাই বই। ইংরেজি বাংলা মেশানো। থ্রিলার-টিলার নয়, রীতিমত সাহিত্যের বই। বিছানার মাথার কাছে বই, পায়ের কাছে বই, কোল-বালিশ করে রাখার মত করে রাখা দু'পাশেই বই—জানালার তাক, মেঝে, কিছুই প্রায় বাকি নেই।

চৌপাই-এর মাথার কাছে একটা টুল। টুলের উপর একটা দিশী মদের খালি বোতলে খাবার জল - আধা ভর্তি। তার পাশে একটা ডট্‌ পেন এবং একটা মোটা খাতা।

ঘরে আর কিছুই নেই। আয়না নেই, ড্রেসিং টেবল্‌ নেই, আলমারী নেই। কাঠের খুঁটিতে পেরেক মেরে তাতে ঝোলানো আছে একটা নীলরঙা তালি-মারা কিন্তু পরিষ্কার জিনের প্যান্ট, হাতাওয়ালা টেনিস খেলার গেঞ্জীর মত গেঞ্জী, পায়জামা, দেহাতী খদ্দরের মোটা পাঞ্জাবি, একজোড়া কাবলী জুতো ঘরের কোণায়। ব্যস-স্‌, আর কিছুই না।

মংলু ঘর ছেড়ে চলে যেতেই মহুয়া টুলটার দিকে এগিয়ে গেল। লণ্ঠনটা তখনও জ্বলছিল। পলতেটা কমিয়ে নিবিয়ে

দিল সেটাকে। তারপর অন্যমনস্কভাবে টুলের উপর রাখা খাতাটা তুলে নিল।

সেই লেখার খাতার প্রথম পাতাতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা আছে সুখরঞ্জন বসু, ফুলটুলিয়া, গুঞ্জা, জেলা—পালামৌ। তারপর লেখা আছে, "রোজকার কথা—হিজিবিজি"।

প্রথম পাতা খুলতেই অবাক হয়ে গেল মহুয়া। ও নিজে সাহিত্য ব্যাপারটা ভালভেসেই পড়েছে। কিছু যা-হয় একটা পড়তে হয় বলে পড়েনি। তাই ডাইরিগোছের খাতাটা দেখে ওর ঔৎসুক্যটা স্বাভাবিক ছিল। এই ঘরে, এমন হাতের লেখায় এমন ডাইরি দেখবে, ও আশা করেনি। ও ভাবল যে, তাহলে ও ভুল করেনি। কাল রাতের মুখটি, সেই গভীর গলার স্বরের মানুষটি, যে তার সমস্ত সত্তাকে শুধু চোখচাওয়াতেই, শুধু কণ্ঠস্বরেই অমন করে নাড়া দিয়েছে—তার মধ্যে কিছু একটা অসাধারণত্ব নিশ্চয়ই রয়েছে। মিস্ত্রীর পরিচয়টা যেন তাকে মানায় না।

আজ আমার জন্মদিন। জন্মদিন হয় বড়-লোকদের, যশ যাদের পয়সা আছে; আর সেই সব বড়-লোকদের, যাদের যশ আছে। আমি দুখন মিস্ত্রির ভাই সুখন মিস্ত্রী—আমার আবার জন্মদিন!

যখন ছোট ছিলাম, মনে আছে, ছোট পিসীমা আসতেন কোডারমা থেকে ঐ সময় আমার জন্মদিন উপলক্ষে নয়—আসতেন ঠাকুরমাকে দেখতে। প্রতি বছর দু' টাকা করে হাতে ধরে দিতেন। বক্সীবাজারে গিয়ে মাধুবাবুর বইয়ের দোকানে ঢুকে একটা বই কিনতাম—নিজের ছেলেমানুষী কাঁচা হাতের লেখায় লিখতাম— "আমার জন্মদিনে আমাকে দিলাম।"—

ইতি সুখরঞ্জন।

কত কী ভেবেছিলাম। ছোটবেলায় কত কী স্বপ্ন দেখেছিলাম। এই করব, সেই করব; এই হবো, সেই হবো।

আর কী হলাম! কি হলাম; মানে মোটর মেকানিক হয়েছি বলে

কোনো দুঃখ নেই। আমি কারো কাছে হাত পেতে খাই না, ভিক্ষা করি না। কারো দয়ার অন্ন নিই না ভাল খাই, মন্দ খাই—খেটে খাই। ঘামের ভাত খাই এতে লজ্জা নেই। কে কী করে সেটা অবান্তর। কোনো কিছু করার মধ্যেই কোনো গ্লানি নেই-- গ্লানিটা বরং কিছুই না-করার মধ্যে। ছোটলোকীর কাজ না করে যারা ভদ্রলোকী কেতায় হাত পাতে, পরের ঘাড়ে স্বর্ণলতার মত ঝুলে থাকে—তারা মানুষ নয়। সে বাবদে আমি মানুষ। এ জীবনে কারো বোঝা হইনি আমি। কারো বোঝাও নিইনি অবশ্য। —এক বৌদি আর শান্তুর দায়িত্ব ছাড়া। সে দায়িত্বকে আমি বোঝা বলে মনে করি না। দাদা মারা গেলেন। এই মিস্ত্রীগিরি করেই আমাকে কোনোভাবে ঋণ শোধের সুযোগ না দিয়েই নিজের জীবনটা প্রায় অবহেলায় নষ্ট করেই তো দাদা মারা গেলেন।

আজ আমার একটাই আনন্দ। দাদা হয়তো বুঝতে পারেন, জানতে পারেন যে, ভাইটা তার অমানুষ হয়নি। বাংলায় এম এ. পাস করার পর একটুও দ্বিধা না করে দাদার হঠাৎ-মৃত্যুর পর দাদার কারখানার ভার সহজে গ্রহণ করেছিলাম। মনে হয় যে, দাদার আত্মা এ কথা জেনে শান্তি পান।

দুঃখটা এই কারণে যে, চিরদিন এই কারখানা আঁকড়েই পড়ে থাকতে হবে—শান্তুটা যতদিন না নিজের পায়ে দাঁড়ায়। সে তো অনেক বছর। বৌদিকে যতদিন না তাঁর স্বাবলম্বনের মত কিছু করে দিতে পারি—ততদিন আমার ছুটি নেই। পড়াশুনা করতে পারি না, লিখতে পারি না এক লাইন। গাড়ির মিস্ত্রী হয়ে কি কখনও লেখা যায়? দুঃখ এইটুকুই রয়ে গেল এ-জীবনে। এ-জীবনে আমাকে অভ্যস্ত হতে হবে কখনও ভাবিনি।

সুখন মিস্ত্রীর জীবনে জন্মদিনের কোন দাম নেই। তার জন্মদিন কেউ মনে রাখেনি কখনও, সে নিজেও না। যার জন্ম একটা জৈবিক বা যৌন দুর্ঘটনা—তার জন্মদিন আবার পালন করার কি? তাছাড়া পালন করেই বা কে? নিমগাছের ঝরা পাতার মত প্রতি বছর এই উত্তর-তিরিশের গাছ থেকে অনেক পাতা ঝরে যায়। এখানে শুধুই লাল-টাগরা দেখানো ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত কাকেদের বাস—ঝরা পাতার, দীর্ঘশ্বাস। ঘুমভাঙা—কাজ,

করা—ঘুম পাওয়া—ঘুম ভাঙা। এ জীবনে কখনও কোনো কোকিল আসেনি, আসবেও না। যতদিন না সব পাতা ঝরে, সব সাধ বাসি ফুলের মালার মত না শুকোয়, ততদিন শুধুই প্রশ্বাস নেওয়া ও নিশ্বাস ফেলা! সুখন মিস্ত্রীর সব জন্মদিনের গন্তব্যই এক। তারা একই দিকে গড়িয়ে যাবে—তার মৃত্যুদিনে।

মহুয়া অনেকক্ষণ চুপ করে সেই ঘরে দাঁড়িয়ে রইল ডাইরিটা হাতে করে। এই ফাটা-ফুটো গ্যারেজ-বাড়িতে যে তার জন্য এত বড় একটা বিস্ময় লুকানো ছিল, তা ও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

সেই স্বল্প-পরিচিত পুরুষের শোবার ঘরে দাঁড়িয়ে তার বুকের মধ্যে ধড়াস্-ধড়াস্ করতে লাগল। সে কী আনন্দে বিস্ময়ে, ভয়ে না বেদনায় তা বোঝার মত ক্ষমতা মহুয়ার ছিল না।

তাড়াতাড়ি কাঁপা-কাঁপা হাতে ও পাতা উল্টে যেতে লাগল—ওর মন যেন কী বলতে লাগল ওকে—ওকে যেন কী এক নীরব ইঙ্গিত দিতে থাকল।

দ্রুত মহুয়ার সুন্দর আঙুলগুলি এসে থেমে গেল ডাইরির একেবারে শেষে।

মহুয়া উত্তেজনায় স্তব্ধ হয়ে গেল। ওর হৃৎপিণ্ড যেন বন্ধ হয়ে গেল।

এত সৌভাগ্যও কি সুখন মিস্ত্রীর ছিল।

যাকে সে জীবনে চোখে দেখেনি অথচ আকৈশোর স্বপ্নে দেখেছিল, যার সঙ্গে আলাপ হয়নি অথচ মনে মনে যে ভীষণ আপন ছিল, যে পৃথিবীর সব সৌন্দর্যের সংজ্ঞা যে সুরুচির শান্ত স্নিগ্ধ প্রতিমূর্তি, যে নারী-সুলভতার সেই চিরন্তন সান্ত্বনাদাত্রী গাছের নিবিড় নরম নিভৃত ছায়া—সে কিনা এমন করে ঝড়ের ফুলের মত উড়ে এল। উড়ে এল সুখন মিস্ত্রীর ভাঙা ঘরে।

এল যদিও, কিন্তু ক্ষণতরে এল, চলেও যাবে ক্ষণপরে।

হায় রে সুখন! তোর সাধ্যি কি একে আদর করিস; একে যত্ন করিস। এ কোকিল সুখন মিস্ত্রীর দাঁড়ে বসার জন্য

জন্মায়নি। দু'দণ্ডের জন্যও না। তোর জন্য নিমগাছভরা দাঁড়কাক। দিনভর, জীবনভর, কা-খ্বা-খ্বা-কা।

আমি জানি, তুমি ক্ষণিকের অতিথি। তুমি তোমার বড়লোক প্লে-বয় বয়-ফ্রেণ্ডের সঙ্গে বয়স্ক বাবার সঙ্গে, ক'দিনের জন্য মজা করতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ। গাড়ি খারাপ হওয়াতে, এই মোটর মেকানিকের ডেরায় এসে রাত কাটালে—কত কষ্ট হল তোমার। গাড়ি সারা হলে কতগুলো টাকা মিস্ত্রীর মুখে ছুঁড়ে দিয়ে তোমরা চলে যাবে।

জানি সব জানি। তবু সুখন, বড় কষ্ট পেলি রে সুখন, বড় কষ্ট পাবি। পৃথিবীটা এরকমই। বাঘবন্দীর ঘর। সে ঘরে সুখন শুধুই মোটর মিস্ত্রী। সুখনের মনের ঘরে, কি টালির ঘরে—কোনো ঘরেই জায়গা নেই মহুয়ার।

তোমাকে জানাবার সুযোগও আসবে না কখনও যে, তোমাকে আমি কী চোখে দেখেছি। তা ছাড়া, জানিয়ে লাভই বা কি? নিজেকে ছোট করা, অপমানিত করা ছাড়া আর তো কিছুই পাওনা নেই আমার তোমার কাছে।

তুমি যে মহুয়া! আর আমি যে হতভাগা সুখন।

তবু, বাঃ মহুয়া! তুমি কি সুন্দর মহুয়া। তুমি কী সুন্দর! তোমার মত এত সুন্দর আর কিছুই আমি এ-জীবনে দেখিনী। কখনও বুঝি দেখব ও না। দুঃখ এইটুকুই যে, তোমাকে কখনও আপন করে পাওয়া হবে না।

আরাম করে পাশের ঘরে ঘুমোও। তোমার একটু কষ্ট হবে। একটা রাত একটা বেলা। বিশ্বাস করো—এ কথাটা—আজ আমার বড় আনন্দ কত যে আনন্দ, তা তুমি কখনও জানতে পাবে না। ঘুমিয়ে থাকো। সোনা মেয়ে।

ডাইরিটা এবার নামিয়ে রাখতে পারলে বাঁচে মহুয়া।

ওর সারা শরীর যেন অবশ হয়ে এল। বুকটা উঠতে-নামতে লাগল। বারান্দায় বেরিয়ে এসে মহুয়া ডাকল, মংলু, আমাকে একটু জল খাওয়াও না। শীগ্গির।

বড় পিপাসা পেয়েছে মহুয়ার। এত পিপাসার্ত ওর সাতাশ বছরের জীবনে আর কখনোই বোধ করেনি ও আগে।

মংলু জল এনে দিল। জল খেয়ে মহুয়া আবারও বাইরে গিয়ে কারখানার পাশের গাছ-গাছালিভরা মাঠে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল।

মাঠটা থেকে কাজে-ডুবে-থাকা সুখনকে দেখতে পাচ্ছিল মহুয়া। পুরুষ মানুষদের কর্মরত অবস্থায় যতখানি সুন্দর দেখায়, তত সুন্দর বোধহয় আর কখনোই দেখায় না—মনে হল মহুয়ার।

পায়চারি করতে করতে মনোযোগের সঙ্গে কাজ করতে থাকা সুখনের দিকে আড় চোখে চেয়ে মহুয়ার হঠাৎ মনে হল, কাউকেই এমন চুরি করে দেখেনি ও এর আগে। কাউকে শুধু চোখের দেখা দেখেও যে এত সুখ, তা ও কোনদিনও জানত না।

আশ্চর্য! মহুয়া ভাবল এখনও ও কতকিছুই জানে না; বোঝে না। কতরকম অননুভূত অনুভূতিই না আছে! অথচ কাল এখানে আসার আগে অবধিও ও দুর্মর ভাবে বিশ্বাস করত যে ও নিজে মোটামুটি সর্বজ্ঞ।

॥ তিন ॥

সান্যাল সাহেব জেগেছিলেন একটু আগে। কুমার তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

বালিশের তলা থেকে বের করে হাতঘড়িটা দেখলেন, সাড়ে আটটা বেজে গেছে। লজ্জিত হলেন তিনি। পরের বাড়িতে এরকম যখন-খুশি ওঠা, যখন-খুশি খাওয়া যায় না। ধড়মড়িয়ে চৌপায়াতে উঠে বসলেন।

ডাকলেন কুমার, ও কুমার!

অনেকক্ষণ ডাকার পর কুমার সাড়া দিল।

কুমার উঠলে বাইরে এলেন দুজনে। এসে মুখ-হাত-ধুয়ে বারান্দায় বসলেন, মংলুর দেওয়া চা নিয়ে।

দূরে মেঘ—মেঘ পাহাড় দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের পর পাহাড়। কাছেপিঠেই টিলা আছে অনেক। ঝাটি জঙ্গল; পিটিসের ঝোপ।

মাঝে মাঝেই ভরভর আওয়াজ করে ছাতারে আর দু' একটা তিতির ওড়াউড়ি করছে। দূর থেকে কালি-তিতির ডাকছে তুররর-তিতি-তিতি-তুররর। সান্যাল সাহেব সকালের আলোয় চারিদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন যে, বড় বড় গাছের মধ্যে বেশিই শাল। সাদা সাদা ফুল ধরেছে তাতে থোকা থোকা। বারান্দায় বসে সামনে প্রায় আধ মাইল খোয়াইয়ে-ভরা লালমাটি, লালফুলে-ছাওয়া টাঁড় দেখা যাচ্ছে। তারপর পাহাড়।

কুমার বলল, বি-উটিফুল কান্ট্রি। কিন্তু ঐ লাল লাল ফুলগুলো কি সান্যাল সাহেব? চতুর্দিকে কার্ল মার্কস্-এর বাণী ছড়াচ্ছে?

সান্যাল সাহেবের মুখে মৃদু হাসি ফুটল। বললেন, তোমরা সব শহুরে ছেলে। মাটির সঙ্গে তো যোগ নেই। এসব জানবে কী করে? আমার ছোটবেলা কেটেছে দেওঘরে, বুঝলে? তখন দেওঘর একদা ছোট্ট শান্ত জায়গা ছিল। ছোটবেলার কথা বড় মনে পড়ে।

লাল ফুলগুলো কি?—অসহিষ্ণু গলায় বলল কুমার।

মনে মনে বলল, বুড়োগুলোর এই দোষ। কথায় কথায় এমন রেমিনিসেন্ট মুডে চলে যান যে, কথা বলাই মুশকিল। শুধোলাম লাল ফুল, এনে ফেললেন ছোটবেলা; দেওঘর। সময়ের যেন মা-বাবা নেই।

সান্যাল সাহেব বললেন, পলাশ, শিমুল, অশোক সবের রঙই লাল। তবে যেগুলো দেখছ, এগুলোর বেশির ভাগই পলাশ। পলাশ জংলী গাছ—বিনা যত্নে বিনা আড়ম্বরে জঙ্গলে পথে-ঘাটে সব জায়গায় ওরা বেড়ে ওঠে।

এমন সময় মহুয়াকে আসতে দেখা গেল।

কুমার লক্ষ্য করল মহুয়ার চোখে-মুখে একটা খুশি উপছে পড়ছে। অথচ ও উল্টোটাই হলে আনন্দিত হতো। কোথায় ওরা এতক্ষণে বেতলাতে ডানলোপিলো সাজানো গ্রীর্জার-লাগানো ওয়েল-ফার্নিশড ঘরের লাগোয়া বারান্দায় বসে ছিমছাম ট্রেতে বসানো টি-পট থেকে ঢেলে চা খেতে খেতে হরিণ দেখত, তা নয়—এই টালির ছাদের নীচে, ছারপোকা ভরা মোড়ায় বসে কেলে

কুৎসিত কাঁচের গ্লাসে বিচ্ছিরি চা খাচ্ছে। মহুয়া যে রকম ফাস্‌সী মেয়ে—ফাস্‌সী বলেই তো জানে কুমার ; তাতে এইরকম পরিবেশে তার খুশি হবার কোনোই কারণ নেই।

কুমার মনে মনে বলল, ব্যাপারটা একটু ইনভেস্টিগেট করতে হচ্ছে। মহুয়ার এত খুশি, খুশবু হঠাৎ! কোত্থেকে?

মহুয়া সিঁড়ি অবধি আসতেই সান্যাল সাহেব শুধোলেন, কোথায় গেছিলি মা?

কারখানা ঘুরে এলাম। গাড়ির কাজ হচ্ছে। উনি বললেন, বিকেলের আগে হবে না।

অ্যাই মরেছে! কোথায় ভাবলাম বেলতায় বসে চান-টান করে একটু বীয়ার খাবো। দুস্‌স। কুমার বলল।

মহুয়া কথা ঘুরিয়ে সান্যাল সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলল, এবার জলখাবার খাবে তো? মংলু একা পারবে না। আমি গিয়ে একটু সাহায্য করি।

কুমার কথা কেড়ে নিয়ে বলল, আরে বোসো বোসো। কী আমার ইংলিশ ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছে যে পারবে না ছোকরা? যা পিণ্ডি বানিয়ে দেবে তাই-ই খাবো!

তারপরই বলল, বুঝলেন সান্যাল সাহেব, যেবার কন্টিনেন্টে যাই—কি কেলেঙ্কারি! ব্রেকফাস্ট মানে কি জানেন? ব্রেড-রোলস আর কফি অথবা চা। টেবিলের উপর মাখন আর জ্যাম বা মার্মালেড রাখা আছে। লাগিয়ে খাও। আর চা বা কফি সঙ্গে। সত্যি! ব্রেকফাস্ট খেতে জানে ইংরেজরা।

স্কচরা আরো ভালো জানে, সান্যাল সাহেব বললেন।

আপনি কি ছিলেন নাকি ওদিকে?

খুব অবাক হয়ে গলা নামিয়ে কুমার শুধোল। ভাবল, অফিসে তো কখনও শোনেনি যে এই বৃদ্ধ ভাম বাইরে ছিলেন কখনও।

সান্যাল সাহেব হাসলেন। বললেন, পাঁচ বছর ছিলাম ইংল্যান্ডে, ছ' বছর সুইজারল্যান্ডে। তুমি তখন পাড়ার গলিতে গুলি অথবা ড্যাংগুলি খেলছ।

কুমার মোড়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। বলল, ওঃ বয়! আপনি

এত বছর বিদেশে থেকে এসেও এখন লুঙ্গি পরেন?

সান্যাল সাহেব হেসে উঠলেন। বললেন, তাতে কি হয়েছে? লুঙ্গি পরতে ভালবাসি তাই পরি, তুমি পায়জামা পরতে ভালবাসো তাই পরো, কেউ কেউ বাড়িতে ধুতিও পরেন। লুঙ্গি পরার সঙ্গে বিদেশে থাকার কি সম্পর্ক?

না, মানে কেমন প্রিমিটিভ লাগে কুমার বলল।

সান্যাল সাহেব পাইপের পোড়া তামাক ঝেড়ে ফেলে বললেন, আমরা কি সত্যিই প্রিমিটিভ নই? আমি তুমি এদেশের ক'জন? ক' পার্সেণ্ট? আমরা দেশের কেউই নই, কিছুই নই। শহর ছেড়ে গ্রামে এসেছ, চোখ কান খুলে দেখো, শোনো, অনেক কিছু জানবে, শুনবে।

কুমার চুপ করে থাকল। ওর চোখে অসহিষ্ণুতার ছাপ পড়ল। মনে মনে বলল, বুড়োগুলোকে নিয়ে এই বিপদ। কথায় কথায় এত জ্ঞান দেয় না! ভাবখানা যেন, জ্ঞান দেওয়ার টাইম চলে যাচ্ছে—এইবেলা না দিলে কখন কে ফুটে যায় কে জানে!

সান্যাল সাহেব হঠাৎই শুধোলেন, তুমি কতদিন বিদেশে ছিলে?

কুমার অপ্রতিভ হল। বলল, সবশুদ্ধ বারো দিন।

তারপর সুবোধ্য কারণে কুমার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

একটু পরে মংলুকে সঙ্গে করে মহুয়া জলখাবার নিয়ে এল। মেটে-চচ্চড়ি, ওমলেট, আলু-কুমড়ো-পেঁয়াজ-কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একটা গা-মাখা তরকারি আর গরম পরোটা। সঙ্গে প্যাঁড়া।

সান্যাল সাহেব মংলুর দিকে সপ্রশংস চোখে চেয়ে বললেন, করেছ কি মংলু? এ যে বেজায় আয়োজন?

মংলু খুশি খুশি গলায় বলল, ওস্তাদ বলেছে আপনাদের কোনো কষ্ট হলে আমার চাকরি থাকবে না। তারপরই এক নিঃশ্বাসে বলল, মেটে চচ্চড়ি দিদিমণির করা।

কুমার বলল, একজন মোটর মেকানিকের ঘাড়ে এত অত্যাচার করাটা ঠিক হচ্ছে না। দিস ইজ্ আনফেয়ার। যাকগে, যাওয়ার সময় মেরামতের বিল ছাড়াও ভাল মত টিপস দিয়ে যাবো। নাথিং ইজ অ্যাজ এলোকোয়েণ্ট অ্যাজ ম্যানি। টিপস্ দিয়ে খুশি করে দেবো সুখন মিস্ত্রীকে।

কুমারের কথাটা শেষ হতে না হতেই সুখন এসে দাঁড়াল সিঁড়ির কাছে প্রায় নিঃশব্দ পায়ে।

মহুয়া পিছন ফিরে ছিল—দেখেনি।

হঠাৎ সুখেনের গলা পেয়ে ফিরে দাঁড়াল।

সুখন বলল, গাড়ির একটা কাটিং শ্যাফ্‌ট লাগবে। আর যা যা দরকার তার সবই আমার কাছে আছে। ফুয়েল ইন্‌জেকশান পাম্পে গোলমাল আছে। কারবোরেটারে ভীষণ ময়লা জমেছে। এইসব আমার কাছে নেই। গুঞ্জা বস্তীতে যে দোকান আছে, তাতেও পাওয়া যাবে না। পাওয়া যেতে পারে একমাত্র রাঁচীতে। লোক পাঠিয়ে রাচী কিংবা ডালটনগঞ্জ থেকে আনতে হবে। কিন্তু মুশকিল হয়ে গেছে যে, আজ সকাল থেকে বাস-স্ট্রাইক! কাল মান্দারের কাছে এক বাসের ড্রাইভারকে খুব মারধোর করে লোকেরা—তাই আজ এ-রুটে সকাল থেকে বাস বন্ধ। অথচ ওটা না হলে ও গাড়ির কিছুই করা যাবে না। কলকাতা থেকে বেরুনোর আগে গাড়িটা দেখিয়ে বেরুনো উচিত ছিল। পথের যে-কোনো জায়গাতেই ভেঙে যেতে পারত। গাড়ি হাই-স্পীডে থাকলে সাংঘাতিক অ্যাকসিডেণ্টও হতে পারত। এ-রকম অবস্থায় এ-গাড়ি নিয়ে বেরুনোটাই আপনাদের অন্যায় হয়েছে।

কুমারের মুখে পরোটা ছিল। গবগবে গলায় বলল, থামো মিস্ত্রী, থামো। তোমার কাছ থেকে দায়িত্বজ্ঞান শিখতে হবে না আমার। এ-রকম কারখানা রাখো কেন? আমরা এসেছি কাল রাতে, এখন বাজে সকাল ন'টা—এখন বলছ যে, গাড়ি সরানো যাবে না। এতক্ষণ কি ঘাস কাটছিলে? না, নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলে?

সান্যাল সাহেব ও মহুয়া একই সঙ্গে কুমারের দিকে চাইলেন।

কুমার কেয়ার না করে বলল, বলো তোমার কি বক্তব্য আছে? বলো মিস্ত্রী।

সুখন অবাক চোখে কুমারের দিকে তাকিয়ে ছিল। ভুরু দুটো কুঁচকে উঠেছিল। অনেকক্ষণ কুমারের দিকে তাকিয়ে থেকে সুখন ধীর গলায় বলল, আমার কিছু বলার নেই।

কুমার বলল, তোমার পক্ষীরাজ গাড়ি নিয়েও তো যেতে পারতে রাঁচী। এতক্ষণে তো পার্টস নিয়ে আসা যেতে।

মংলু মধ্যে পড়ে রাগ রাগ গলায় বলল, ও গাড়ি গুঞ্জা বস্তী অবধি যায়—তাও অতি কষ্টে।

সুখন এক ধমক দিয়ে মংলুকে চুপ করিয়ে দিল।

কুমার বলল, গুঞ্জায় তো যাবেই। মদ আনবার জন্য যেতে পারে, আর আমাদের গাড়ির পার্টস আনার জন্য রাঁচী যাওয়া যায় না?

কুমার আবার বলল, বাস স্ট্রাইক তো ট্যাক্সীর বন্দোবস্ত করে মাল আনালে না কেন? আমরা কি ফালতু লোক? কত টাকা চাই তোমার? টাকা নিয়ে যাও যত চাও, কিন্তু গাড়ি তাড়াতাড়ি ঠিক করে দাও।

সুখন শান্ত গলায় বলল, আমি কিন্তু আপনাকে বরাবর 'আপনি' করেই কথা বলছি সম্মানের সঙ্গে।

কুমার বলল, বলবে বৈকি। সম্মানের জনকে সম্মান দেবে না! তুমিও কি আমাকে তুমি বলতে চাও নাকি?

সান্যাল সাহেব সুখনের চোখে প্রলয়ের পূর্বাভাস দেখে থাকবেন। তিনি তাড়াতাড়ি করে কুমারকে ধরে টেনে নিয়ে গেলেন ঘরের দিকে।

কুমার ঘরে না গিয়ে, বাইরে বেরিয়ে চলে গেল। বলল, আমি জায়গাটা সার্ভে করে আসছি।

কুমার চলে যেতে সান্যাল সাহেব কুমারের অভদ্র ব্যবহারের পাপক্ষালন করে নরম গলায় বললেন, তার মানে, কাল সকালে লোক পাঠিয়ে বিকেলে নিয়ে আসতে পারবেন তো? এই তো বলতে চাইছেন আপনি? নিয়ে আসার পর কতক্ষণের মধ্যে গাড়ি ঠিক হয়ে যাবে?

মনে হয়, দু-তিন ঘণ্টায়। সুখন বলল।

সুখন মুখ নীচু করেছিল।

বেশ! বেশ! তাই-ই-হবে। আমরা তো আর জলে পড়ে নেই। এমন সুন্দর পরিবেশ, আদরযত্ন, ভালই তো হল। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য!

তারপর সুখনের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবার জন্য বললেন, আপনি, কি বলেন?

সুখন প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা, ভাবাবেগহীন গলায় বলল, তাহলে রাতেই আমার লোককে টাকাটা দিয়ে দেবেন যাতে সকালের প্রথম বাসেই চলে যেতে পারে।

সান্যাল সাহেব বললেন, রাতে কেন? এক্ষুণি নিয়ে যান। কত টাকা?

সুখন বলল, এখন দেবেন না। নেশাভাঙ করে উড়িয়ে দিতে পারি। আমরা সব ছোটলোক; ভরসা কি? রাতেই দেবেন। তিনশো টাকা।

কথা ক'টি বলেই সুখন ফিরে, কারখানার দিকে পা বাড়াল।

মহুয়া ডাকল। বলল, শুনুন সুখনবাবু।

সুখন থেমে তাকাল।

মহুয়া বলল, আপনি খেয়ে যান। একটা তরকারি আমি নিজে রেঁধেছি।

সুখন হাত তুলে অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলল, ধন্যবাদ। অনেকদিন হল আমার সকালে খাওয়ার অভ্যেস চলে গেছে। আপনারা খান। আপনারা খেলেই আমার খাওয়া হবে।

তারপরই বলল, মংলু, এঁদের ভাল করে যত্ন করছিস তো? সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আমাকে একটু চা দিয়ে যাস কারখানায়।

সুখন চলে যেতে, মহুয়াও ওর নিজের খাবার নিয়ে মংলুর সঙ্গে রান্নাঘরে চলে গেল।

যাবার সময় মুখ নীচু করে সান্যাল সাহেবকে বলে গেল, বাবা তোমার কিছু লাগলে আমায় ডেকো।

একটু পরই কুমার ফিরে এল। এসেই বলল, একটা ট্র্যাশ্ জায়গা। এমন ব্যাড্ লাক্ এবারে যেমন জায়গা তেমন মিস্ত্রী। কাল রাতে এলাম এখন সকাল ন'টায় বলছেন যে গাড়ির কাটিং শ্যাফট্ ভেঙে গেছে।

সান্যাল সাহেব বললেন, আমরাও ন'টা অবধি ঘুমোচ্ছিলাম। দোষ তো আমাদেরও। তাছাড়া, তাড়া কিসের অত? এই-ই তো বেশ, আস্তে আস্তে যাওয়া—তোমার তো আর কনফারেন্স নেই বেতলার হাতি কি বাইসনদের সঙ্গে।

পরিবেশটাকে লঘু করবার জন্য বললেন সান্যাল সাহেব।

কুমার বলল, না, আমার এইরকম পয়েন্টলেস্‌ভাবে টাইম ওয়েস্ট করা একেবারেই বরদাস্ত নয়।

সান্যাল সাহেব একটু চুপ করে থেকে বললেন, কুমার তোমাকে একটা কথা না বলে পারছি না। ভদ্রলোকের সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করলে কেন? মনে হয় উনি লেখাপড়াও জানেন, লেখাপড়া জানুন আর নাই জানুন, নিজে হাতে খেটে খান—সেটাই তো যথেষ্ট সম্মানের বিষয়—তোমার এই ব্যবহারের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না আমি।

কুমার বলল, আই এ্যাম সরি! কিন্তু প্রথম দেখা থেকেই লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারিনি! জিনের প্যাণ্ট, ফ্রেডপেরী গেঞ্জী, মুখ-চোখের ভাব, তাকাবার কায়দা—লোকটার মধ্যে মডেস্টি বলতে কিছু নেই। এমন একটা ভাব যেন আমাদের সঙ্গে সমান-সমান ও। আই ওয়ান্টেড টু কাট্‌ হিম ডাউন টু হিজ্‌ ও-ওন্‌ সাইজ।

সান্যাল সাহেব অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন কুমারের দিকে।

বললেন, স্ট্রেঞ্জ!

তারপর বললেন, যাই-ই হোক, তোমার ব্যবহারের দায়িত্ব আমাদের উপরও বর্তেছে। কারণ তুমি আমাদের সঙ্গী। আমি তোমাকে প্লেইন্‌লি বলব, তোমার এই নিষ্প্রয়োজনীয় অভদ্রতা আমি পুরোপুরি ডিস-অ্যাপ্রুভ করি। তুমি তাতে যাই-না মনে করো না কেন।

কুমার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধত গলায় বলল, আমি একাই আমার দোষ-গুণের দায়িত্ব নিতে রাজী। কারো অ্যাপ্রুভাল বা ডিস-অ্যাপ্রুভালের তোয়াক্কা করি না আমি।

সান্যাল সাহেব বললেন, ভাল কথা। জানা রইল আমার।

এর পরেই পরিবেশে একটা ভারী নীরবতা ছাড়িয়ে গেল, জেঁকে বসল।

সবার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে, মহুয়া নিজে হাতে বেশি করে ময়াম দিয়ে চারটে পরোটা ভাজল। তারপর প্লেটে সাজিয়ে

নিয়ে, চা ক'রে মংলুর হাতে প্লেটের উপর চা বসিয়ে নিয়ে কারখানার দিকে চলল।

কুমার বারান্দায় বসে সিগারেট খাচ্ছিল। সান্যাল সাহেব বাথরুমে গেছিলেন চান করতে।

কুমার বলল, কোথায় চললে?

কারখানায়।

কেন? বলেই কুমার উঠে দাঁড়াল রাগতভাবে।

মহুয়া বলল, আমাদের হোস্টকে খাওয়াতে।

তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, এতে আপনার কি কোনো আপত্তি আছে?

কুমার বলল, ঘরে এসো, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

এক মিনিট কী ভাবল মহুয়া। তারপরে বলল, আপত্তি আছে তাহলে। কিন্তু কেন? আপত্তি করার কে আপনি? আমার যা খুশি আমি তাই-ই করব। আমি কি আপনার পোষা পুতুল?

কিন্তু তারপরই বারান্দায় উঠে এসে ঘরে গেল।

কুমার আগেই ঘরে গেছিল। ঘরের এদিকে জানালা ছিল না। দরজার অন্য পাশে মহুয়া গিয়ে পেঁছতেই কুমার তাকে জোর করে আলিঙ্গনাবদ্ধ করল। আবেগের সঙ্গে বলল, তুমি এরকম করবে নাকি? ব্যাপার কি? একটা মিস্ত্রীর জন্য এত দরদ উথলে উঠল কেন? আমি তোমাকে ভালবাসি মহুয়া—আই মীন ইচ…।

মহুয়া ছটফট করে উঠল। চোখে আগুন ঝরিয়ে বলল, সো হোয়াট?

কুমার জোর করে কামড়াবার মত করে মহুয়ার ঠোঁটে চুমু খেল।

মহুয়া তাকে ধাক্কা দিয়ে চৌপায়ার ওপরে ফেলে দিয়ে গরম নিঃশ্বাস ফেলে বলল, শুনুন আপনি, ভালবাসা ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না, ভালবাসার যোগ্য করতে হয় নিজেকে। আই হেট দিস। আই হেট ইউ।

তারপর বলল, আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। আপনি এরকম জোর করেছিলেন আমাকে, একবার আমাদের ফ্ল্যাটে।

সেদিন আপনাকে কিছু বলিনি। কারণ আপনার সম্বন্ধে আমার তখনও দ্বিধা ছিল। ভেবেছিলাম, আপনাকে কোনদিন ভালবাসতেও বা পারি। কিন্তু আজ দ্বিধা নেই আর। আপনার নামের পিছনে অনেক ডিগ্রী, ভাল চাকরি ; যাকে তাকে—আপনি অনেক মেয়েকেই পেতে পারেন—যারা আপনার যোগ্য। আমি আপনার যোগ্য নই। আমার পথ ছাড়ুন।

কুমারের উত্তরের প্রত্যাশা না করেই মহুয়া ঝড়ের বেগে বাইরে চলে গেল।

গিয়েই, অত্যন্ত সহজ গলায় হেসে বলল মংলুকে, চলো মংলু। তোমাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলাম। দাদাবাবু গেঞ্জি খুঁজে পাচ্ছিলেন না ; খুঁজে দিয়ে এলাম।

কুমার চৌপাইতে আধ-শোয়া অবস্থায় বসে মহুয়ার কথা শুনল। মহুয়ার অভিনয় করার ক্ষমতা, সহজ হবার ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেল। কুমারের পেট তখনও ওঠা-নামা করছিল উত্তেজনায়। ও মনে মনে বলল, এই মেয়েরা এক অদ্ভুত জাত। এদের কিছুতেই বুঝতে পারল না সে।

সান্যাল সাহেব তোয়ালে জড়িয়ে ঘরে এলেন চান সেরে। বললেন, কি হল তোমার ?

কুমার বলল, বুকে ব্যথা করছে—বড় বেশি সিগারেট খাচ্ছি আজকাল।

সান্যাল সাহেব ওর দিকে তাকালেন। অন্য সময় হলে হয়তো কিছু বলতেন, কুমারের ভাষায় 'জ্ঞানও' দিতেন। কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এখন শুধু বললেন, বেশি শিগারেট খেও না। বলেই জামা-কাপড় পরতে লাগলেন।

কারখানার মধ্যে মংলুকে নিয়ে ঢুকতেই একটা শোরগোল উঠল। নানারকম ধাতব ও উচ্চগ্রামে বাজতে থাকা আওয়াজগুলো মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেল। মিস্ত্রীর কাজ থামিয়ে সকলেই মহুয়ার দিকে চেয়ে রইল।

মহুয়াকে চেহারায় সহজেই ফিল্ম আর্টিস্ট বলে ভুল করা যায়। লম্বা, ছিপছিপে। ভারী ভাল ফিগার। অত্যন্ত সুন্দর চোখ, নাক ও মুখ। মাথা ভরা চুল। সরু কপালে মস্ত একটা টিপ। সবচেয়ে বড় কথা, ওর হাঁটা-চলা-কথা বলার মধ্যে এমন

এক আড়ম্বরহীন আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্ব আছে যে, ওর দিকে চাইলে যে-কোনো উচ্চশিক্ষিত, মার্জিত ও রুচিবান পুরুষেরই চোখ আটকে যায়। আর এই গণ্ডগ্রামে মিস্ত্রীদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

সুখন মিস্ত্রী নেই। কোথায় গেছে কাউকে বলে যায়নি। মংলুর সঙ্গে মিস্ত্রীদের যে হিন্দীতে কথাবার্তা হল, তাতে মহুয়া বুঝতে পারল যে, সুখন মিস্ত্রী হলেও সুখনকে অন্য মিস্ত্রীরা অত্যন্ত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে; হয়তো বা ভয়ও করে।

ওরা ফিরে এল। পিছন ফিরতেই কারখানার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহুয়ার রূপ সম্বন্ধে নানা অশ্লীল মন্তব্য কানে এল মহুয়ার।

মংলু পিছন ফিরতেই ওদের ধমক দিল। বলল, ওস্তাদকে বলে দিলে জিভ ছিঁড়ে নেবে ওস্তাদ; তখন মজা বুঝবে।

ওরা সমস্বরে দেহাতী হিন্দীতে বলল, ওস্তাদকে বলিস না। আমরা তো বেয়াদবি করিনি। সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছি শুধু। প্রথমে মিস্ত্রীদের এই অশালীনতা মহুয়ার খুব খারাপ লাগল। তারপরই এক অদ্ভুত ভাললাগা ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কুমারের কাছে যে সুখন অপমানিত হয়েছে—সেই অপমানের দুঃখ, মিস্ত্রীদের মুখের বুলিতে নিজে অপমানিত হয়ে যেন কিছু পরিমাণে শুধতে পারল। এই শোধের বোধটা বড় সুখের বোধ বলে মনে হল মহুয়ার।

ফেরার পথে মংলুর সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কী সব কথা হল মহুয়ার। ওরা দুজনে যেন কী সব বুদ্ধি-পরামর্শ করল। ওরা ছাড়া আর কেউই তা জানতে পারল না।

মহুয়া ফিরে এসে চান করতে গেল।

ও ফিরে আসতেই কুমার কারখানায় গিয়ে পেঁছিল। মিস্ত্রীদের দামী সিগারেট খাইয়ে তার গাড়ির অবস্থা ও সুখন মিস্ত্রীর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে যা জানা যায়, জানার চেষ্টা করল।

যা জানল কুমার, তা ওর পক্ষে মোটেই সুখকর নয়। তার গাড়ির সম্বন্ধে যা জানল, তা অত্যন্ত খারাপ এবং সুখন সম্বন্ধে যা জানল, তা অত্যন্ত বিরক্তিজনকভাবে ভাল। এ-বাজারে এতগুলো মিস্ত্রী-হেল্পার লোকেদের হৃদয়ের একচ্ছত্রাধিপতি

হওয়ার মত এমন কী গুণ থাকতে পারে সুখনের, তা কুমার ভেবে পেল না।

কারখানার একপাশে নিমগাছে ছায়ায় বসে সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়ে কুমার অনেক কিছু ভাবতে লাগল।

ওর একটা গুণ আছে - সেটা এই যে, ওর দোষ-গুণ সম্বন্ধে ও সম্পূর্ণ সচেতন। ও যে সুখন মিস্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে সেটা ও জেনেশুনেই করেছে। সুখনকে অপমান করে ওর দারুণ ভাল লেগেছে। ও জানে যে, অন্যায় করেছে ও—কিন্তু করেছে।

ও কাল রাতে বুঝতে পেরেছিল যে, মহুয়া ও সুখন দুজন দুজনকে দেখে কেমন যেন হয়ে গেছে। ও ঘাস খায় না। ওর বুঝতে ভুল হয়নি যে, এই বিহ্বলতার মানে কি। ও কপালে কোনোদিনও বিশ্বাস করেনি—পুরুষাকারে বিশ্বাস করেছে—পুরুষালি জেদে বিশ্বাস করেছে—কিন্তু কপাল বলে যে কিছু আছে, এ-কথা অস্বীকার করবার মত জোর পায় না আজকে, এই মুহূর্তে। কপাল না থাকলে—যে গাড়ি তাকে একদিনও ডোবায়নি গত চার বছরে—সে গাড়ি এমনভাবে ডোবাবে কেন? আর ডোবাবেই বা যদিও, তাও সুখন মিস্ত্রীর গ্যারেজের কাছে? এইসব ঘটনাবলীর পেছনে কোনো শালা অদৃশ্য ভগবানের হাত অবশ্যই আছে।

মহুয়া সঙ্গে এই বারে আসার পেছনে সবিশেষ ও গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল কুমারের। পৃথিবীতে সব কাজের পেছনে একটা 'মোটিভ' থাকে। এত এত পরীক্ষা পাস করে এসে, এত এত বাঘা-বাঘা ইণ্টারভ্যু বোর্ডের মেম্বারদের ঘোল খাইয়ে শেষে কিনা একটা মোটর মেকানিকের কাছে হেরে যেতে হবে ওকে। যে কম্‌পিটিটরের হিট-এ ওঠারই কোনো সম্ভাবনা ছিল না, সে কিনা ফাইন্যালে জবরদস্তী করে ঢুকে পড়ে ওকে হারিয়ে দেবে?

অত সহজ নয়।—দাঁতে দাঁতে চেপে কুমার বলল।

ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট ধরে কুমার মনে মনে বলল, ভগবান বা আর যারই হাত থাক—মহুয়াকে ও চায়। পর এই চাওয়াটা হয়তো ভালবাসার আদালতের জুরিসপ্রুডেন্স জানে না। কিন্তু তবু ওর চাওয়াতে কোনো মেকী নেই। মহুয়াকে ও চেয়েছে এ

জীবনে ; ও জানে মহুয়াকে ও পাবে। জীবনে যা কিছু চেয়েছে —জেদ ধরে চেয়েছে ; অথচ পায়নি এমন দুর্ঘটনা ওর জীবনে কখনোও ঘটেনি। যদি ভগবান থেকে থাকে—তবে সেই শালা ভগবানেরই নামেই ও শপথ করেছে যে, মহুয়াকে পাবেই— মহুয়াকে জীবন-সঙ্গিনী করবে ও। মহুয়াকে সত্যিই কুমার ভালবাসে। ভালবাসার সঠিক মানে হয়তো জানে না ও। শুধু জানে মহুয়াকে দেখলেই কেমন একটা সেন্‌সেশান হয়। মাথার মধ্যে, তলপেটে কী যেন একটা পোকা ওকে কুরে কুরে নিঃশব্দে খেতে থাকে।

না, না, মহুয়াকে না পেলে ওর চলবে না। সিরিয়াসলি বলছে ঃ হি মাস্ট হ্যাভ হার। বাই হুক্ ওর বাই ক্রুক্।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর একটা ইরিটেটিং আলস্য। কিছুই করার নেই। গড়িয়ে, বসে, সিগারেট খেয়ে ধু-ধু গরম ধোঁয়া ওঠা উদোম টিঁডিয়াস-টাঁড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্লান্তি লাগছিল কুমারের। খেয়ে-দেয়ে পায়জামার দড়ি ঢিলে করে দিয়ে চৌপায়াতে শুয়ে পড়েছিল কুমার, এবং কখন যেন ঘুমিয়েও পড়েছিল।

সান্যাল সাহেবের বয়স হলেও দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যাস কোনোদিনই নেই। ছুটির দিনে, খাওয়ার পর মিনিট পনের ইজিচেয়ারে শুয়েই উঠে পড়েন। ম্যাগাজিন পড়েন, ক্রসওয়ার্ড নিয়ে বসেন, তারপর বেলা পড়লে বাড়ি সংলগ্ন একফালি জায়গা-টুকুতে ফুল, লতা গাছগুলোতে জল-টল দেন নিজে হাতে, দেখা-শোনা করেন।

সান্যাল সাহেব লুঙ্গি পরে হাতকাটা গেঞ্জি গায়ে সুখনের দরজা খোলা ঘর থেকে খুঁজেপেতে একটা এস্কিমোদের উপর লেখা বই বের করলেন—ফারলি মোয়াটের লেখা—'দ্যা পিপল্ অব দ্যা ডীয়ার'। তারপর বারান্দায় এসে ইজিচেয়ারে আধো-শুয়ে, পাইপটাতে অন্যমনস্কতায় তামাক ভরে ধরিয়ে নিয়ে বইটা নিয়ে পড়লেন। ভাবলেন, সুখন ছোকরা এরকম জারগায় বসে এমন এমন সব বই যোগাড় করল কোথা থেকে ?

সান্যাল সাহেবের বারান্দায় এসে বসার আরো একটা কারণ ছিল। উনি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, সুখনকে নিয়ে কুমার আর মহুয়ার মধ্যে একটা চাপা মনোমালিন্য ঘটেছে। এ

ব্যাপারটার জন্য সান্যাল সাহেব খুশি ছিলেন না। চাইছিলেন যে ওরা একটু নিরিবিলি পেলে এই ব্যাপারটা মিটিয়ে নিক নিজেরাই।

সান্যাল সাহেব ভাবছিলেন যে, কুমারের আর যাইই দোষ থাক, কুমারের মত ভবিষ্যৎসম্পন্না জামাই এ যুগে পাওয়া দুষ্কর। ছেলেটা মেধাবী, চিরকাল স্কলারশিপ নিয়ে পড়েছে—ন্যাশনাল স্কলারশিপও পেয়েছে। কাজ খুবই ভাল জানে। কিন্তু অত্যন্ত অসচ্ছল অবস্থা ও সাদামাটা জীবন থেকে এসে যারা নিজগুণে জীবনে স্বচ্ছলতার মুখ দেখে এবং আশাতীত ইম্পর্ট্যান্স পেয়ে যায়, তাদেরই মাথা খারাপ হতে দেখা যায় বেশি। তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। সাইকেলের পেছনে গুড়ের বস্তা নিয়ে যে বাড়িবাড়ি গুড় বিক্রি করত, সেই ফেঁপেফুলে উঠে গাড়ি চড়ে বেড়াবার সময় সাইকেল—আরোহীকে ধাওয়া করে নর্দমায় ঠেলে ফেলে আনন্দ পায়। এ তিনি নিজের জীবনেই বহু দেখেছেন, আসলে প্রত্যেক মানুষই তার বুকের মধ্যের অন্য একটা পুরনো চাপা পড়ে যাওয়া মানুষকে ভুলে যেতে চায়। কিন্তু ভুলতে না পেরে সেই মানুষের প্রতিভু অন্য মানুষদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। একজন মানুষ, তার মধ্যের একখণ্ড মানুষকে যতখানি ঘৃণা করে, কোনো জানোয়ার তার নিজের কোনো অঙ্গকে অন্ধ-ক্রোধে কামড়ালেও সেই ঘৃণার সমকক্ষ হয় না। সমস্ত মানুষকেই জীবনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'জানোয়ারের কাছেও হার মানতে হয়। সান্যাল সাহেবকেও হয়েছে সান্যাল সাহেব জানেন, কুমারের হার মানতে হবে।

জীবনের দুই তৃতীয়াংশ অতিক্রম করে এসে আজ সান্যাল সাহেব বুঝতে পারেন, শুধু বুঝতে পারেন যে তাই-ই নয়, উনি বিশ্বাস করেন যে, জীবনে ভারসাম্য না রাখলে, না থাকলে কোনো একটি ক্ষেত্রে দারুণ গুণী হয়েও কিছুমাত্রই লাভ নেই। বড় এঞ্জিনিয়ার, এ্যাকাউন্টান্ট বা বড় জার্নালিস্ট খুব সহজেই হওয়া যায়—কিন্তু সুস্থ, সীমা-জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হওয়া যায় না। সেটা বড় কঠিন কাজ।)

কুমারের মেধা ও বাল্যকালের অসাচ্ছল্য ও অপ্রতীয়মানতার পরিপ্রেক্ষিতে যৌবনের সাচ্ছল্যই ওর সবচেয়ে বড় শত্রু হয়েছে।

ওর সাফল্যেই ওর সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

সান্যাল সাহেব ভাবছিলেন যে, এ-দেশে সবচেয়ে গরীবের ঘরের ছেলেরাই অবস্থার পরিবর্তন হলে সবচেয়ে বেশি ক্রূর দুর্মর ও নিষ্ঠুর বুর্জোয়া হয়। অথচ উল্টোটাই হওয়া উচিত ছিল; হলে ভাল হতো। তারা যদি অন্যের দুঃখ না বোঝে তো কারা বুঝবে?

এরা না এ্যারিস্টোক্যাট না প্রলেতারিয়েত। এরা ডুডুও খায়, তামাকও খায়।

যাই-ই হোক, এ-সবই দোষ। কিন্তু এমন কোনো দোষ নয় যে, কুমারকে জামাই হিসাবে ভাবা যায় না। আর বড় জোর বছর পাঁচেকের মধ্যেও এত বড় কোম্পানির একটা পুরো ডিভিশনের নাম্বার ওয়ান হয়ে যাবে। অর্থাৎ মাইনেও ও পার্কস্ মিলিয়ে যা পাবে, তারপর সাপ্লায়ার কনট্রাকটরদের ভেট-টেট তো আছেই—সারাজীবন রাজার হালে হেলে-দুলে চলে যাবে।

বর্তমান সমাজে এই কুমারের মত জামাইরা সুদুর্লভ। 'পাত্র-পাত্রী' শিরোনামা এদেরই আড়ম্বরপূর্ণ ও নির্লজ্জ ঢাকের শব্দে ভরে থাকে। সান্যাল সাহেব সব জানেন, বোঝেন; তিনি বোকা নন। জেনেশুনে তিনি তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্য এমন জামাই হাতে পেয়েও হাতছাড়া করতে দিতে পারেন না। এর একটা আশু-বিহিত দরকার।

কিন্তু মহুয়া বড় জেদী মেয়ে। কলকাতায় বেশ ছিল—উইক এণ্ডে ক্লাবে যেত, সিনেমায় যেতে দুজনে, কুমারের যখন আসবার কথা, তখন ইচ্ছে করে সান্যাল সাহেব ফ্ল্যাট ছেড়ে অন্য কোথাও যেতেন—অন্য কারো ফ্ল্যাটে অথবা ক্লাবে অসময়ে গিয়ে বসে ম্যাগাজীন উল্টোতে উল্টোতে বীয়ার সিপ করতেন।

কুমার আর মহুয়ার সম্পর্কটা রীতিমতো ঘন হয়ে এসেছিল, চিকেন এ্যাসপারাগাস্ স্যুপের মতন উনি তাতে বড় খুশি ছিলেন। কুমার ছেলেটার এমনিতে কোনো দোষ নেই পেডিগ্রী নেই এই ই যা, ব্যাড-ব্রীডিং, সে কারণে বস্তী বস্তী ভাবটা রয়ে গেছে ওর মধ্যে পুরোমাত্রায়। কিন্তু সান্যাল সাহেব জীবনে অনেক দেখলেন, আজ এটা তিনি বিশ্বাস করেন যে, একটা মিনি-

মাম এ্যামাউণ্ট অব ঔদ্ধত্য ও গর্ব ছাড়া এবং এমন কি ক্রুডনেস ছাড়াও জীবনে ম্যাটেরিয়ালী বড় হওয়া যায় না/।

এই মিস্ত্রী ছোকরা ভাল ছেলে সন্দেহ নেই কিন্তু মহুয়া যদি তাকে কুমারের সঙ্গে তুলনীয় বলে ভেবে থাকে, তাহলে শুধু কুমারের প্রতিই নয়, তার নিজের প্রতিও অত্যন্ত অন্যায় করবে।

বইটা কোলেই পড়ে থাকল সান্যাল সাহেবের। উনি ভাবতে লাগলেন। বাইরে ধুলো উড়তে লাগল। লাল ধুলো। গরম হাওয়ার সঙ্গে লু চলছে। শুকনো শালপাতা পাথরে জমিতে গড়িয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘুর্ণি উঠছে। হলুদ, লাল, পাটকিলে শুকনো পাতা, খড়কুটো, সব কুড়িয়ে জড়িয়ে হাওয়ায় স্তম্ভ উঠছে উপরে ঘুরপাক খাচ্ছে—নাচছে; তারপর সেই স্তম্ভটা শালবনের কাঁধ ছুঁই-ছুঁই হলেই হাওয়াটা ওদের বিকেন্দ্রীকরণ করে রাশ আলগা করে ছেড়ে দিচ্ছে। একরাশ খুদে ভারহীন ছত্রবাহিনীর সৈন্যদের মত ওরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে—মাধ্যাকর্ষণে নেমে আসছে যেখান থেকে ঊর্ধ্বলোকের আশায় রওয়ানা হয়েছিল সেই অধঃলোকে।

সান্যাল সাহেব অন্যমনস্ক হয়ে দেওঘরের দিনগুলোয় ফিরে গেছিলেন। ডিগারিয়া পাহাড়—পাহাড়ের মাথায় রোজ সাঁঝের-বেলায় দেখা শান্ত সন্ধ্যাতারা একটি মিষ্টি সাধারণ শ্যামল ময়ের মুখ—শালবনের ভেতরে। বিবাহিতা অল্পবয়সী একটি মেয়ে। সান্যাল সাহেব তাকে ঘর থেকে বাইরে এনে নিজের ঘরে তুলেছিলেন। সান্যাল সাহেব কখনও সংস্কার মানেন নি, সমাজ মানেন নি। লুঙ্গি পরলে কি হয়, মনেপ্রাণে জানেন যে, পুরোদস্তুর সাহেব তিনি। কিন্তু সেই শ্যামলী মেয়েটি মহুয়াকে উপহার দেওয়ার পরই তাঁকে সেই ঘরে মেয়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একা রেখে এক দুর্মর উচ্চাকাঙ্ক্ষা—ও আরো বিলাসী। জীবনের মোহে পড়ে ওদেরই কোম্পানির এক ফরাসী ডিরেকটরের সঙ্গে পালিয়ে গেছিল। শ্যাম্পেনের দেশের লোকের নাকে বাংলার শ্যামলা মেয়ের গায়ের বনতুলসী গন্ধ ভারী ভাল লেগে গেছিল বুঝি। ঘর ভাঙতে, ঘর বাঁধতে এবং আবার ঘর ভাঙতে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল শ্যামলী। এর পরে তার কোনো খবর

সান্যাল সাহেব আর রাখেন নি। রাখার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। লোকমুখে শুনেছেন যে, ভালই আছে শ্যামলী সম্প্রতি। সেদিন থেকে নারীচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর মনে এক অসীম দুর্জ্ঞেয়তা ছাড়া আর কোনো অনুভূতিই অবশিষ্ট নেই। পুরো মেয়ে জাতটা সম্বন্ধে—একমাত্র নিজের রক্তজাত মেয়ে ছাড়া—তিনি একেবারেই নিস্পৃহ হয়ে গেছেন। প্রত্যেকটি মেয়েকে তিনি মনে মনে ঘৃণা করেন সেদিন থেকে। ঘৃণা বললেও ঠিক বলা হয় না; একটা ঘৃণাজনিত ও অনুশোচনাজনিত উদাসীনতার শিকার হয়েছেন তিনি।

আশ্চর্য! শ্যামলীকে আব মনেও পড়েনি কখনও। কিন্তু দেওঘরে যে সাধারণ অল্পে-সন্তুষ্ট বিনয়ী ও বোসিক্যালী ভাল স্কুল-মাস্টারের স্ত্রী ছিল শ্যামলী, যার ঘর ভেঙে সান্যাল সাহেব কোকিলের মত উজ্জ্বল কালো শ্যামলীকে নিয়ে এসেছিলেন, সেই লোকটার কথা বার বার মনে পড়ে। তাঁর লোকটার অনুযোগহীন, উদার উদাস চোখে দুটির কথা মনে পড়ে। পালিয়ে আসার পর ভদ্রলোক শ্যামলীকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন—একটিই—তাতে লিখেছিলেন যে, তুমি যদি খুশি হয়ে থাকো, সুখে থাকো, তাহলেই ভাল। তুমি যা চেয়েছিলে, যা আমি দিতে পারিনি ও কখনও পারতাম না, তা সুধীর সান্যালের কাছে পাবে শুধু এই কামনা করি।

সান্যাল সাহেব জানেন যে একমাত্র এই লোকটার কাছেই উনি হেরে গেলেন, হেরে রইলেন, হেরে থাকবেন সারাজীবন।

॥ চার ॥

এখন দুপুর খাঁ-খাঁ।

একমাত্র শীতকাল ছাড়া অন্য সব ঋতুতেই দুপুর আড়াইটে থেকে চারটে অবধি একটা ভারী, ক্লান্ত ও মন্থর নিস্তব্ধতা যেন প্রকৃতিকে পেয়ে বসে।

সান্যাল সাহেব বই পড়তে পড়তে কখনও যা করেন না, সেই

কর্ম করলেন আজ। একটু গড়িয়ে নেওয়ার জন্য ঘরে গেলেন। ঘরের জানালা সব বন্ধ। দরজা ভেজানো। মধ্যেটা অন্ধকার, ঠাণ্ডা। উপরের টালির ফাঁক-ফোঁক দিয়ে ও জানালা-দরজার ফাটা ফুটো দিয়ে আলো এসে এক লালচে উদ্ভাসনায় ঘরটাকে চাপাভাবে উদ্ভাসিত করে রেখেছে। বাইরে লু বইছে তখনও। পাতা ওড়ানোর পাতা খসানোর আর পাতায়-পাতায় হাওয়ার ঝরণা ঝরানো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দূরের নির্জন নির্যান সড়ক বেয়ে গোঁ গোঁ করে, ক্বচিৎ ট্রাক যাচ্ছে গরম হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কুয়োয় লাটাখাম্বা উঠছে নামছে। কোনো মিস্ত্রী-টিস্ত্রী চান করছে বোধহয়। লাটখাম্বার ক্যাঁচোর-ক্যাঁচোর একঘেয়ে যন্ত্রণাকাতর একটা আওয়াজ সমস্ত খাঁ-খাঁ পরিবেশকে আরো বেশি উদাস ও বেদনাবিধুর করে তুলেছে।

সান্যাল সাহেব ঘরে যাওয়ার পরই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কুমারেরও নাক ডাকছিল। মহুয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করে পাশ ফিরে বাঁ-হাতটা দু'চোখের উপরে রেখে শুয়েছিল।

একটুক্ষণ পরেই সান্যাল সাহেবের গভীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। ভেতরে ঘর-ভরা ঘুম ; বাইরে দুপুর নিঝুম।

মহুয়া আস্তে উঠে নিঃশব্দে আয়নার সামনে দাঁড়াল।

ঘরের এই সামান্য আলোয় নিজের মুখ ভাল দেখতে পেল না মহুয়া। তবু, যতটুকু আলো ছিল, সেই আলো আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে তার দুটি গভীর চোখে পড়ল এবং পড়েই দ্বিতীয়বার প্রতিফলিত হল আয়ানায়। হাতব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে নিয়ে চুলটা একটু আঁচড়ে নিল ; মুখে একটু ভেসলিন লাগাল, ঠোঁটেও। হাওয়াটা বড় শুকনো, সারা-গা, মুখ চোখ সব জ্বালা জ্বালা করছে। তারপর দরজায় একটুও শব্দ না করে বেরিয়ে পড়ল। বেরোবার সময় ঝোলানো থার্মোফ্লাক্সটা তুলে নিল দেওয়ালের পেরেক থেকে।

রান্নাঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে মংলু মেঝেতেই শুয়ে ছিল।

দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুলল। শালপাতার দোনায় পুরী, তরকারি, প্যাঁড়া সব সাজিয়ে রেখেছিল ও। উনুনে তখনও আঁচ ছিল। এগুলো একটু গরম করে নিয়ে শালপাতার

দোনায় আবার বেঁধে-ছেদে নিল। তাড়াতাড়ি নিজে-হাতে চা বানাল মহুয়া—দারুচিনি এলাচ এলাচ এসব দিয়ে। যাতে বেশিক্ষণ ফ্লাস্কে থাকলেও গন্ধ না হয়ে যায় চায়ে। তারপর চা-টা ফ্লাস্কে ঢেলে মংলুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল মহুয়া।

ডানহাতেব হাত ঘড়িতে সময় দেখল একবার—চারটে বাজতে দশ। বাড়ির পেছনদিকে বেড়ার মধ্যে একটা বাঁশের দরজা ছিল। তা দিয়ে গলে বাইরে বেরুতেই বড় অশ্বত্থ গাছ। ঝরণার মত শব্দ হচ্ছিল হাওয়ায় এই গাছের পাতার।

তারপরেই একটু খোয়াই; খোয়াইটুকু পেরিয়ে একটা উঁচু বাঁধের মতো—বাঁধের উপরে সামান্য জল; একটা দহ। গোটা চারেক দুধ-সাদা গো-বক ঠা-ঠা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে। কালো-কালো ছোট্ট দুটো হাঁসের মত পাখি জলে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটছে, আর বা পরক্ষণেই জলে ঢেউয়ের বৃত্ত তুলে ডুব দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে পড়ে অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে মহুয়া শুধলো, ওগুলো কি পাখি?

মংলু বলল, ডুবডুবা।

মহুয়া অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে চলেছে। ও বাবার সঙ্গে কাশ্মীরে গেছে, নৈনিতালে গেছে, উটীতে গেছে, যায়নি এমন ভাল জায়গা নেই ভারতবর্ষে, অথচ এই অখ্যাত অজানা ছোট জায়গা—এই ফুলটুলিয়ার বিবাগী রুক্ষ দুপুরে যে, চোখ ভরে এত কিছু দেখার ছিল, কান ভরে শোনার ছিল, ও কখনও তা স্বপ্নেও ভাবেনি।

দুটো শুয়োর কাদায় প্যাচ-প্যাচ আওয়াজ তুলে হাঁটু অবধি কাদা মেখে দৌড়ে গেল অন্যদিকে।

মহুয়া চমকে উঠে মংলুর বাহু ধরে ওকে দাঁড় করাল। বড় বড় চোখ করে ভয়-পাওয়া গলায় ওকে শুধোল, জংলী?

মংলু হাসল। বলল, না, না। এসব কাহারটোলার শুয়োর। একটু পরই পথটা শালবনের মধ্যে ঢুকে গেছে। এখানে গরম অনেক কম—ছায়া আছে বলে। আঁকাবাঁকা লাল মাটির পথ চলে গেছে নালা পেরিয়ে, টিলা এড়িয়ে বনের অভ্যন্তরে। জঙ্গলের মধ্যে পাতার শব্দে হাওয়াটাকে ঝড় বলে মনে হচ্ছে। মাথার

উপর দিয়ে ঝড়ের চেয়েও দ্রুতগামী টিয়ার ঝাঁক, ঘন সবুজের মধ্যে কাঁচ-কলাপাতা সবুজের ঝিলিক তুলে, মস্তিষ্কের কোষে কোষে চমক হেনে, উধাও হয়ে যাচ্ছে নীল নির্জন ঝকঝকে আকাশে।

কি একটা পাখি ডাকছিল দূর থেকে। চিঁহা···চিঁহা··· চিঁহা···চিঁহা···চিঁহা···চিঁউ···চিঁউ···চিঁউ।

মহুয়া অবাক হয়ে শুধলো, এটা কি পাখি?

মংলু বিজ্ঞের মত বলল, তিত্তির। আগে ডাক শোনেন নি?

মহুয়া বাচ্চা মেয়ের মত সরল হাসি হাসল। বলল, 'কখনও না।'

মহুয়ার মন এক দারুণ ভাললাগায় ভরে গেছিল। এই পরিবেশ, অত্যন্ত স্বল্প পরিচিত একটা মানুষ, কিন্তু যার প্রথম পরিচয়ের শিকড় অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত হয়ে গেছে মহুয়ার ভেতরে সেই সুখনের জন্য এই নিয়ে হাতে খাবার বয়ে নিয়ে যাওয়া, অপরিষ্কার জীর্ণ রান্নাঘরে চা বানানো উবু হয়ে বসে— এ-সবের মধ্যেও একটা ভীষণ আনন্দ পেয়েছিল। নিজেকে কষ্ট দিয়ে অন্যকে আনন্দিত করতে যে এমন অভিভূত হতে হয় তা ও আগে কখনও জানেনি।

আনন্দ আর সুখ এ দুই অনুভূতি একই পাড়ার বাসিন্দা ছিল আগে ওর মনে। এরা যে সম্পূর্ণ বে-পাড়ার লোক মহুয়া জানত না। প্রথম জানল।

কুমার তাকে অপমানসূচক কথা বলার পরেই কারখানায় গিয়ে, মিস্ত্রীদের কাজ-টাজ বুঝিয়ে সুখন উধাও হয়ে গেছিল। একমাত্র মংলু জানত ও কোথায় যায়; যেতে পারে। কালুয়াকে আর দেখা যায়নি তারপর। মানে, সুখন চলে যাওয়ার পর থেকে।

মংলু বলছিল, কালুয়া ওস্তাদকে এত ভালবাসে যে, ওস্তাদ বলছে, ওস্তাদ মরে গেলে তাকে শাকুয়া-টুঙে কবর দিয়ে কালুয়ার জন্য তার পাশেই যেন একটা ঘর বানিয়ে দেয় মিস্ত্রীরা।

মহুয়া মংলুকে শুধলো, এই শাকুয়া-টুঙ ব্যাপারটা কি?

উত্তরে মংলু উৎসাহের সঙ্গে বলল, শাকুয়া-টুঙ শালবনের

মধ্যের একটা টিলার চুড়ো। সেখানে বসে পুরো পালামৌ জেলার এবং হাজারীবাগ জেলারও কিছু জঙ্গল চোখে পড়ে। ওস্তাদ ওখানে একটা ছোট্ট ঘর বানিয়েছে। মাটির দেওয়াল, মাটির মেঝে, উপরে ঘাস। বেশিরভাগ ছুটির দিনে, অথবা মনে দুঃখ-টুঃখ হলে ওস্তাদ ওখানে গিয়ে কাটায়। কোনো-কোনোদিন সারারাতও থাকে।

মহুয়া অবাক হয়ে বলল, বাবু সেখানে করেন কি ?

মংলু তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, কী-সব লেখাপড়ি করে চুপ করে বসে থাকে।

আর খান কি ? মহুয়া আবার শুধলে।

কিছুই না। মহুয়ার দিনে মহুয়ার ফল চিবোয়। পিপাসা পেলে নিচের ঝরণায় গিয়ে জল খায়। ওস্তাদ বলে—'বুঝলি মংলু, আমি হচ্ছি ময়াল সাপের জাত। একবার খেলে বহুদিন আমার খেতে হয় না।'

মংলুর সঙ্গে কথা ছিল মহুয়াকে সুখনের কাছে পেঁীছে দিয়েও দৌড়ে ফিরে যাবে। কুমার আর বাবাকে বিকেলে চা-জলখাবার করে দেবে। আর ঘুণাক্ষরেও জানাবে না কাউকে যে, মহুয়া কোথায় গেছে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে যে বড় রাস্তার দিকে যেতে দেখছে ও দিদিমণিকে। যাওয়ার সময় দিদিমণি ওকে বলে গেছেন—একটু বেড়িয়ে আসছি, সন্ধ্যার আগেই ফিরব।

আর একটু এগোতেই টিলাটার কাছাকাছি এল ওরা। এমন সময় দূরে কোথা থেকে মাদলের আওয়াজে ও একটানা ঝিম-ধরা গানের সুর শোনা গেল। কিছু অসংলগ্ন দূরাগত কথাবার্তা। পুরুষকণ্ঠই বেশি—স্ত্রীকণ্ঠও ছিল, মাদল মাঝে মাঝে থামছে—টুকরো টুকরো কথার পরই আবার বেজে উঠছে।

মংলুকে শুধোতে সে বলল যে, কোনো শাদি-টাদি আছে বোধ হয়। নিচে ছোট্ট একটা বস্তী আছে গঞ্জুদের।

ওরা ছোট টিলাটা চড়তে শুরু করেছে পাকদণ্ডী পথ দিয়ে, এমন সময় একটা মোড় ঘুরতেই মহুয়া হঠাৎই সুখনের একেবারে মুখোমুখি এসে পড়ল। সুখন হনহনিয়ে কোথায় চলেছিল, বোধ-হয় কারখানার দিকেই। ধাক্কা লাগছিল আর একটু হলে।

সুখন হঠাৎ মহুয়াকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল।

বলল, এ কি ? কি ব্যাপার ? আপনি এখানে কেন ?

তারপরই আবার বলল, এটা কি একটু বাড়াবাড়ি হল না ?

মহুয়ার আনন্দ, উৎসাহ সবই এক মুহূর্তে নিভে গেল। রোদে হেঁটে ওর সমস্ত মুখ লাল হয়ে গেছিল।

কিন্তু সুখন মহুয়ার অমন সুন্দর, ভাললাগা আর ভালবাসায় মোহিত অমন অনুতাপ-কাতর মুখটির দিকে একবার তাকালও না।

অন্যদিকে চেয়ে বলল, 'কি রে মংলু ? তোকে কে আনতে বলেছিল দিদিমণিকে এখানে ? মেরে শালা তোর দাঁত ভেঙে দেবো !'

মংলু ভয়ে সিঁটিয়ে গেল।

কালুয়া সুখনের পায়ে-পায়ে এসেছিল—সে-ও সুখনের রাগ দেখে কেউঁ কেউঁ করে উঠল।

সুখন ধমক দিয়ে বলল, 'বল্ কে আনতে বলেছিল ?'

মংলুকে আড়াল করে হতভম্ব মহুয়া মুখ তুলে বলল, 'এটা অন্যায়। কিছু বলার থাকলে আমাকে বলুন। ওর কি দোষ ?'

তখনও সুখন অন্যদিকেই মুখ ঘুরিয়ে ছিল।

বলল, দেখুন, ন্যায়-অন্যায় আমাকে শেখাবেন না। এখন ভালয় ভালয় এখান থেকে চলে যান। বলেছি তো, 'আপনাদের গাড়ি পার্টস এলেই ঠিক করে দেবো। ভাঙা হোক, যাই-ই হোক, আমারই বাড়ি থেকে তো অন্যায়ভাবে অপমান করে আপনারা আমাকে তাড়ালেন—তবু সুখন মিস্ত্রীর কি একটু নিরিবিলি থাকারও উপায় নেই—নাকি গাড়ির মালিকদের কাছে তামাম জিন্দগী বিকিয়েই বসে আছে সে ?'

পরক্ষণেই, সোজা মহুয়ার চোখে তাকিয়ে ধমকের গলায় সুখন বলল, কী চান কি আপনারা সবাই, আপনি ; আমার কাছে। বলতে পারেন, কী চান ?

মহুয়া মুখ নামিয়েই ছিল।

মংলু সুখনের এই ব্যবহারের কারণ বুঝতে না পেরে অত্যন্ত ব্যথিত মুখে জঙ্গলের দিকে তাকিয়েছিল, কাঁধে থার্মোফ্লাস্ক ঝুলিয়ে আর হাতে খাবার নিয়ে।

মহুয়া মুখ তুলে সুখনের দিকে তাকাল।

হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মত সুখন মুখ তুলে আবিষ্কার করল ; আবিষ্কার করল মহুয়াকে। আবিষ্কার বলব না, বলা উচিত পুনরাবিষ্কার করল। আবিষ্কার তো কাল রাতের লণ্ঠনের আলোতেই সে করেছিল।

সুখন তার অন্তরের অন্তরতম তলে অনুভব করল যে, ওর দিকে আজ পর্যন্ত কখনও কোনো নারী এমন চোখে তাকায়নি।

সুখন দেখল দু' ফোঁটা জল মহুয়ার চোখের পাতার চিকন-কালো গভীরে টলটল করছে—শীতের সকালের গোলাপের পাপড়ির গায়ের শিশিরের মত উজ্জ্বল নির্মল। তার মুখ, কপাল, গাল যেন এতখানি রোদে হেঁটে এসে লাল হয়ে উঠেছে পদ্মকলির গোড়ার দিকের কোমল লালে। সুখনের খুব একটা ইচ্ছে করেছিল। মংলু সামনে না থাকলে, সে ইচ্ছেকে ও সফল করত—করতই—। ইচ্ছে করছিল, দুটি চকিত চুমুর উত্তাপের বাষ্পে মহুয়ার সেই দু' চোখের জল ও শুষে নেয় ; মুছে দেয় !

সুখন মহুয়ার চোখে চোখ রেখেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

দু' ফোঁটা জল চোখ ছাড়িয়ে, গাল গড়িয়ে, বুক টপকে এসে লাল মাটিতে পড়ল। রুক্ষ মাটি মুহূর্তে তা শুষে নিল।

সুখন অপ্রস্তুত অপ্রতিভ গলায় বলল, 'যাঃ বাবা ! এ আবার কি ? মহাঝামেলা দেখছি।'

'বিশ্বাস করুন'—বলেই ওর দু'হাত মহুয়ার দু' বাহুতে রাখবে বলে হাত উঠিয়েই পরক্ষণেই অবাক মংলুর দু'কাঁধে রাখল। রাখলো তো না, যেন থাপ্পড় মারল।

এবার বলল, 'কিরে মংলু, সেই সকাল থেকে কিছু খাইনি। কিছু খেতে দিবি, না হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবি ?'

বলেই মহুয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আসুন, আসুন এতদূর যখন আমারই জন্য, এ-হতভাগাকেই খাওয়াবেন বলে এলেন, তখন চলুন আমার ডেরাটা দেখে যাবেন।'

সুখন আগে আগে চলতে লাগল। একটু উঠেই ঘরটা চোখে পড়ল। জায়গাটার তুলনা নেই। ঘরটারও না। লাল ও হলুদ, মাটির দেওয়াল, তাতে নানা রকম আদিবাসী মোটিফ আঁকা ! পরিষ্কার করে গোবর-নিকোনো বারান্দা।

সামনেটাতে কি এক মন্ত্র বলে যেন পৃথিবী হঠাৎ বেঁটে হয়ে গিয়ে এই মালভূমির পদপ্রান্তে নেমে গেছে—প্রায় পাঁচশ' ফিট—নেমে গিয়েই যেন গড়িয়ে গেছে শ'য়ে শ'য়ে মাইল সবুজ, ঘন-সবুজ, হলদেটে-সবুজ, লালচে-সবুজ এবং পত্রশূন্যতার পাটকিলে রঙা জমাট-বুনন গালচে হয়ে গড়াতে-গড়াতে চতুর্দিকে যতদূর চোখ যায়, বিস্তৃত হয়ে গিয়ে দিগন্ত-রেখার তিন সীমানায় পেঁ।চেছে।

ঘরটা ছোট। একদিকে একটা চৌপাই—বারান্দায় একটা দড়ির ইজিচেয়ার। শালকাঠের বুক-র্যাক। তার উপর কিছু বইপত্র। কোণায় মেটে কলসী ; জল রাখার।

ঘরে পেঁীছে সুখনের মেজাজটা একটু শান্ত হল মনে হল। শামুক যেমন অভ্যন্তরে তুলতুলে থাকে, তেমন তার স্বাভাবিক নম্রতার স্বভাবে ফিরে গিয়ে, বাইরের শক্ত খোলস ভুলে গিয়ে সুখন বাবান্দা কোণায় বসে বলল, 'দে, মংলু, খেতে দে।'

মহুয়া মুখ নামিয়েই বলল, 'এবার মংলুকে ছুটি দিলে ভাল হতো। মংলুর ওখানে কাজ আছে। মংলুর মত অত ভাল না পারলেও, আপনাকে খাবারটুকু দিতে পারব আশা কবি।'

সুখন চকিতে মুখ তুলে মহুয়ার দিকে তাকাল। মহুয়া যে সুখনকে একা চায় এ-কথা বুঝল-ও। অনভ্যস্ত ভালো-লাগায় সুখনের বুকটা মুচড়ে উঠল।

মুখে বলল, 'আপনাব বাবাকে, কুমারবাবুকে খাবার-টাবার দিতে হবে—তাই না।' তারপর বলল, 'যারে মংলু, তুই যা।'

মংলু মহুয়ার দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ পর ওর মুখে হাসি ফুটল। বলল, 'চললাম দিদিমণি।'

কেন জানে না, মংলু এই দিদিমণির প্রেমে পড়ে গেছে—একজন বারো-তেরো বছরের দেহাতী সরল ছেলের দাবীহীন মিষ্টি প্রেম।

'যেতে নেই ; এসো।'—মহুয়া বলল মংলুকে।

নড়বড়ে দড়ির ইজি-চেয়ারটা এনে পেতে দিল সুখন। বলল, 'বসুন। কিন্তু হেলান দিয়ে বসবেন না ; ছারপোকা আছে।'

মহুয়া হাসল। বলল, আপনি কোথায় বসবেন ?'

'এই যে'—বলেই সুখন জিন-পরা অবস্থাতেই মাটির বারান্দার

উপর আসন করে বসে পড়ল।

মহুয়া বলল, 'খুব খিদে পেয়েছে, না? পায়নি খিদে?'

'খিদে? না না। আমার খিদে-টিদে সব মরে গেছে। মেরে ফেলেছি।'

তারপর একটু থেমে উদাস গলায় বলল, 'সব খিদেই।'

সুখনের সামনে মাটিতে বসে পড়ে, শালের দোনার বাঁধনটা ঢিলে করতে করতে মহুয়া বলল, কার উপর এত অভিমান? খালি পেটে চা আর জর্দা-পান খেয়ে কী প্রমাণ করতে চান আপনি?'

সুখন হাসল।

দারুণ দেখাল হাসিটা—অন্তত মহুয়ার চোখে।

সুখন বলল, 'প্রমাণ কিছুই করার নেই! জ্যামিতিব অঙ্ক মেলানোর দিন চলে গেছে। বলতে পারেন, এখন যা কিছুই করি তার সবটাই কিছু অপ্রমাণ করার জন্য।'

মহুয়া চুপ করে থাকল একটু। সুখন মিস্ত্রীর হঠাৎ-উত্তরের অভাবনীয়তায় অবাক হয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

তারপর বলল, 'পুরীগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে! যে ঠাণ্ডা খাবার দেয়, তার খারাপ লাগে। তাছাড়া, ঠান্ডা কেউ কি খেতে পারে?

'আমি পারি'।—সুখন বলল।

তারপর খেতে খেতে বলল, 'আমাকে খাওয়াতে আপনার খারাপ লাগছে হয়তো, আমার কিন্তু আপনার হাতে খেতে ভারী ভাল লাগছে। এমন আদর করে কেউ আমাকে কখনও খাওয়ায়নি। মা'র কথা মনে নেই। তারপর তো স্কুল-কলেজের হোস্টেলেই কেটেছে।'

মহুয়ার চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে এসেছে। বাইরে রোদের তাপও নরম হয়েছে। হাওয়ার তোড় কমে আসছে। লম্বা হয়ে শাল-সেগুনের ছায়া নামছে জঙ্গলে। নিচ থেকে নানারকম পাখির ডাক ভেসে আসছে মাদলের আওয়াজের সঙ্গে মিশে।

মহুয়া বলল, 'খান তো; ভাল করে খান। বাড়িতে একটু আচার-টাচার রাখেন না কেন?'

'আচার?'—বলেই একটু হাসল সুখন।—বলল, 'আচার-

টাচার তাদেরই মানায়, খাওয়াটা যাদের কাছে একটা বিরাট ব্যাপার, মানে, সুখের ব্যাপার। আমরা খাই তো খেতে হয় বলে। গরমের দিন মাসের পর মাস বিউলির ডাল আর একটা তরকারিতে চলে। শীতের দিনে প্রায় রোজই খিচুড়ি, সঙ্গে আলু কি বেগুনভাজা। খাওয়া ব্যাপারটাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কোনো মানেই দেখি না আমি।' তারপর একটু থেমেই বলল, 'খুবই সুখের বিষয়, মংলুও দেখে না।'

'বেশ। এবার খান। খাওয়ার সময় অত কথা বলতে নেই। হজম হবে না। বলেই, মহুয়া উঠে ঘরে গিয়ে কুঁজো থেকে গড়িয়ে চটে-যাওয়া কলাই-করা একটা গ্লাসে করে জল নিয়ে এল।

সুখন বলল, 'খাওয়ার সময় জল খাই না।' তারপরেই বারান্দার কোণে নামিয়ে রাখা ফ্লাস্কের দিকে চেয়ে বলল, 'ফ্লাস্কে কি ?' চা ? তাহলে খেয়ে উঠে চা খাব।'

মহুয়া বলল, 'আমি তাহলে জলটা খাই ? ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।'

খাওয়া থামিয়ে সুখন বলল, 'পাবেই তো! অতখানি পথ, রোদে। তার উপর আপনাদের তো অভ্যেস নেই। কেন যে এত কষ্ট করলেন, বুঝলাম না। কুমারবাবু খারাপ ব্যবহার করেছেন আমারই সঙ্গে। তাতে আপনার অপরাধবোধ কেন ? আপনি না থাকলে ও-ইঁদুরটাকে মেরে দুপা ধরে তুলে পুরনো মবিলের টিনে মুখ চুবিয়ে দিতাম। সুখন মিস্ত্রীকে চেনে না! শুধু আপনার জন্য, আপনারই জন্য সহ্য করতে হলো ; করলাম।'

মহুয়া জল খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বলল, 'কেন ? আমার জন্যই বা কেন ? আমি আপনার কে ?'

সুখন খাওয়া থামিয়ে মুখ তুলল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল! কী বলবে, ভেবে পেল না। তারপর বলল, 'কেউ নন। কেউ নন বলেই তো!'

একটু ভেবে বলল, 'হঠাৎ এসে পড়লেন, একদিনের মেহমান।'

খেতে খেতে সুখন মনে মনে বলল—কেন জানি না, আপনাকে দেখার পর থেকেই কেমন হয়ে গেলাম। আমার মধ্যে যে এতসব নরম ব্যাপার-ট্যাপার ছিল, আমি জানতাম না। গাড়ির শক্ এ্যাবজরবারের মত আমার মনটাও একটা যন্ত্র হয়ে গেছিল।

কোনোরকম আনন্দ বা দুঃখই আর সাড়া জাগাত না তাতে। এক দিনের জন্য এসে আমার সব গোলমাল করে দিলেন।

তারপরই চোখ তুলে মহুয়ায় দিকে অনেকক্ষণ পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, 'কেন এলেন বলুন তো?'

মহুয়া মুখ নামিয়ে চুপ করে রইল। কথা বলল না কোনো। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

মনে মনে ও নিজেকে বলল—আমিই কি জানতাম যে আমি এমন? আমি তো নিজে আসিনি। পুরো ব্যাপারটাই বুঝি প্রি-কণ্ডিশানড্।

তারপর বলল, 'আপনার তো নাম সুখ। এখানে স্থানীয় লোকেরা আপনাকে সুখন বলে ডাকলে ডাকুক, আপনি নিজেও নিজেকে সুখন বলেন কেন? বিচ্ছিরি শোনায়।'

'কি জানি? কখনও ভেবে দেখিনি। সুখ নামটা হয়তো আমাকে মানায় না বলে।'

মহুয়া কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'সুখরঞ্জন তো একেবারেই মানায় না। আমি কিন্তু আপনাকে সুখ বলে ডাকব।'

সুখন বিদ্রূপের হাসি হাসল। বলল, 'ক' ঘণ্টা। আর ক' ঘণ্টা থাকছেন এখানে। সুখ বা অসুখ যা আপনার ইচ্ছে, তাই বলেই ডাকতে পারেন। যে নামেই ডাকুন না কেন, এখান থেকে চলে গেলেই লোকটাকে ভুলে যাবেন। মানুষটাকেই যখন মনে থাকবে না, তখন একটা নাম নিয়ে এত তর্ক কিসের?

'আপনি জানেন, আপনি সবই জানেন, না?'

'কি জানি'! সুখন শুধলো।

তারপর আবার বলল, 'বোধহয় জানি। কিন্তু যা 'জানি, সেটা ঠিক কিনা জানি না।'

তারপরই গেঞ্জীর হাতায় জংলীর মত মুখ মুছে বলল, 'চা দিন।'

মহুয়া এতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল মানুষটার ছটফটে, ছেলেমানুষী স্বভাব। বয়স হয়েছেঃ কিন্তু বড় হয়নি একটুও। কালুয়া দূরে তিন-ঠ্যাঙে বসে একদৃষ্টিতে সুখনের খাওয়া দেখছিল। সুখন শালপাতা মুড়ে একটা পরোটা ও মেটের তরকারি দিয়ে এল তাকে পলাশ গাছের গোড়ায়। খাবারটা দিতে

গিয়ে সামনে তাকিয়েই থমকে দাঁড়াল। মহুয়ার দিকে ফিরে বলল, 'দেখেছেন? বেলা পড়ে যাওয়াতে কেমন দেখাচ্ছে সামনেটা এখান থেকে?'

মহুয়া তাকাল ওদিকে। ধুলোর ঝড়ের মধ্যে, প্রখর উষ্ণ ঝাঁজের মধ্যে পলাশের লাল বুঝি এতক্ষণ ঝাপসা ছিল। সারা দুপুর আগুনে পুড়ে সব খাদ ঝরে গেছে সোনার এখন লালে একটা নরম স্নিগ্ধতা লেগেছে। লালের ছোপে-ছোপে সবুজের মহিমা আরো খলেছে যেন।

ও বলল, 'সত্যি! আপনার এই শাকুয়া-টুঙ্-দারুণ!

ফ্লাস্ক খুলতে-খুলতে একদৃষ্টে ওদিকে চেয়ে মহুয়া জীবনে এই প্রথমবার জানল, ওর সাতাশ বছর বয়সে যে, প্রকৃতির কী দারুণ প্রভাব মানুষের মনের উপর! এই উদার উন্মুক্ত জঙ্গলে যার যা-কিছু দাবী আছে সবই বুঝি দিতে পারা যায় কাউকে, কিছুই বাকি না রেখে।

সুখন ফ্লাস্কের ঢাকনিতে চা নিল। পরক্ষণেই মহুয়ার কথা মনে হওয়াতে ও বলল, আপমি এটা নিন, আমাকে গ্লাসেই চা ঢেলে দিন।'

'না না। ঠিক আছে।' মহুয়া বলল।

সুখন কঠিন গলায় বলল, কথা শুনতে হয়। আপনি আমার চেয়ে অনেক ছোট।'

'ই-শ্— ! কতই যেন ছোট।' ঠোঁট উল্টে মহুয়া বলল।

হাসতে হাসতে সুখন বলল, 'অনেক ছোট। দশ-বারো বছরের ছোট তো বটেই।'

'আহা, মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি ম্যাচিওরড্ হয়। এই ডিফারেন্সই নয়।'

'হুমম'— বলল সুখন।

পরক্ষণেই চায়ে চুমুক দিয়েই চমকে উঠে বলল, 'চা কে বানিয়েছে? এতো মংলুর হাতের চা নয়? আপনি?

মহুয়া মুখ নামিয়ে বলল, 'কেন? খারাপ হয়েছে?'

সুখন পুলকভরে বলল, 'খারাপ কি? দারুণ হয়েছে। একেবারে টাটী-ঝারীয়ার পণ্ডিতজীর দোকানের চায়ের মত ফারস্ট ক্লাশ।'

চা খাওয়া হলে, মহুয়া ব্যাগ হাতড়ে কাগজের মোড়ক বের করল একটা। বলল, 'এই নিন।'

সুখন হাত বাড়িয়ে নিল।

মহুয়া ঠোঁট টিপে হাসছিল।

আবার বলল, 'এই নিন, এটাও; আমি আপনাকে দিলাম, আমার প্রেজেণ্ট।' বলেই, ছোট টিনটা এগিয়ে দিল সুখনের দিকে।

হাসছিল সুখনও। প্যাকেটের মধ্যে পান এবং একশো-বিশ জর্দার আস্ত একটা টিন পেয়েই, খুশিতে ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলল একি? কোত্থেকে পেলেন?'

মহুয়া বলল, 'কি কিম্ভূতকিমাকার নাম রে বাবা। একশো বিশ!'

সুখন হাসল। বলল, 'চারশো বিশ হলে খুশি হতেন?'

দুজনেই হেসে উঠল। তারপর দুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ।

বেলা পড়ে এসেছিল। রোদের তেজ নেই আর। পশ্চিমাকাশে ম্লান একটা গোলাপী আভা ঝুলে রয়েছে। শাকুয়া-টুঙে বসে অস্তগামী সূর্যকে তখনও দেখা যাচ্ছে। আর তারই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে উল্টোদিকে উদীয়মান চাঁদ। দোলের আর তিনদিন বাকি। সূর্য আর চাঁদে মিলি পৃথিবীকে চব্বিশঘণ্টাই উজালা করে রাখবে বলে স্থির করেছে যেন।

এখানের এই এক মজা। দিনে যত গরমই থাক না কেন, আলোটা কমে আসতেই কেমন শীত-শীত করতে থাকে। অন্ধকার হয়ে গেলে তো কথাই নেই। তখন পাতলা সোয়েটার বা চাদর থাকলে, বাইরে বসতে ভাল লাগে।

চা খেয়ে, পান খেয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে সুখন চুপ করে পেছনে একপাশে বসে মহুয়াকে দেখছিল।

মহুয়া বারান্দাটার সামনের দিকে বসে নিচের উপত্যকার দিকে চেয়েছিল।

মহুয়ার মদের নেশা যেমন সুখনকে এখানে বহু রাত ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে; তেমন মহুয়া নামের এই মেয়েটির আশ্চর্য সান্নিধ্যর আমেজ ওকে যেন আরো কোনো তীব্রতর নেশায় আবিষ্ট, আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।। মহুয়াকে অবশ করেছে এই প্রকৃতি,

এই হঠাৎ-দেখা, হঠাৎ কাছে-আসা, রুক্ষ, ছেলেমানুষ ও বর্বর পুরুষটি। মহুয়ার সাতাশ বছরের জীবনের পরমপুরুষ।

অনেকক্ষণ এমনি করেই দুজনে চুপ করে বসেছিল। দুজনে বারান্দার দু'দিকে, আগে পিছনে! মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান। ব্যবধান শুধু ভূমির নয়, অনেক কিছুর।

বাইরে দিনের নিভন্ত রঙ, সন্ধের আসন্ন তরল অন্ধকার, চাঁদের ফুটন্ত আলো, ঘর-ছাড়া টি-টি পাখির বুক-চমকানো ডাক ও ঘরে-ফেরা টিয়ার দলের তীক্ষ্ম ছুরির ফলার মত স্বগতোক্তি, সব মিলে-মিশে ভেঙে-চুরে যখন দারুণ কোনো একটা মিশ্র ও আলৌকিক আবেশের সৃষ্টি হচ্ছে ধীরে ধীরে—চুপিসারে—প্রকৃতির আধো-খোলা বুকের মধ্যে, তখন সুখন আর মহুয়ার বুকের মধ্যেও অনেক কিছু বোধ-সংস্কার, আনন্দ-দুঃখ, পাহাড়ী নদীর স্রোতের মধ্যের তাণ্ডবে গড়াতে-থাকা ক্ষয়িষ্ণু নুড়িগুলোরই মত ক্রমান্বয়ে ভাঙচুর হচ্ছিল। ওরা কেউই চেতনে ছিল না। অবচেতনের আশ্চর্য কুঠুরীতে এক পরিপূর্ণতায় স্বপ্নে ওরা দু'জনেই ডুবে গেছিল। ওরা দু'জনে ভাঙচুর হচ্ছিল যে-যার মনের মধ্যে। একের ভাবনা অন্যে জানছিল না। ভাবনা তো দেখানো যায় না। দু'জনের অজানিতে, এই ফিসফিসে গুমরানো বনজ বাতাসে ওরা একে-অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠছিল।

নীচের নদীর অন্ধকার খোলে-খোলে পেঁচা ডেকে ফিরছিল—কিঁচর কিঁর, কিঁ-চিঁ-কিঁ-চিঁ-কিচর—। ওদের কানে আসছিল অথচ সে ডাক কানে আসছিলও না। এক নিষিদ্ধ অথচ নির্মল আত্ম-অবলুপ্তির মধ্যে ওরা দুজনেই দুজনের সান্নিধ্যের নরম নেশায় যেন বেদম বুঁদ হয়েছিল।

কতক্ষণ যে ওরা ওইভাবে বসেছিল, ওরা কেউই জানে না।

যখন হুঁশ হল তখন তখন একেবারে বেলা পড়ে গেছে। নিচু থেকে নানারকম রাত-চরা পাহাড়ী পাখি ডাকছে। চারদিকে, বারান্দায়, উপত্যকায় তরল সুগন্ধি ক্ষণিক অন্ধকার তখন।

আলোর মধ্যে ওরা নিরুচ্চার ছিল। অন্ধকারে ওদের দু'জনেরই মন কিছু বলার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

হঠাৎ নিচের পাহাড়ী নদীর খোল থেকে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে

একটা ভয়-পাওয়ানো বুক-চমকানো ডাক ভেসে এল।

মহুয়া ভীষণ ভয় পেয়ে, কী করবে ভেবে না পেয়ে এক দৌড়ে সুখনের একেবারে কাছে চলে এল।

দেওয়ালে হেলান দিয়ে, দু'পা সামনে ছড়িয়ে বসেছিল সুখন। কাকে এই সমর্পণ জানে না সুখন। কিন্তু এমন সমর্পণী অবস্থায় কখনো ও নিজেকে আবিষ্কার করেনি।

সুখন ওর সবল ডান হাতে মহুয়াকে অভয় দিয়ে ওকে কাছে টেনে বসাল।

মহুয়ার বুক ওঠা-নামা করছিল সত্যি-সত্যি-সত্যি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল ও।

সুখন মহুয়ার রেশমী-চুলের মাথাটি ওর বুকের কাছে নিয়ে এসে ডান হাত দিয়ে ওকে আশ্বাসে, অভয়ে, বড় যতনভরে জড়িয়ে রইল।

ফিসফিস করে বলল, 'ভয় পেয়েছেন ?'

লজ্জা, ভয়, এই হঠাৎ অভাবনীয়ভাবে সুখনের বুকে আসার আনন্দ সব মিলিয়ে মহুয়া অস্ফুটে বলল, হুঁ।

সুখন কথা বলল না কোনো। ওর থুতনিটা মহুয়ার সিঁথির উপর ছুঁইয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ।

মহুয়া মুখ তুলে এক সময় বলল, 'ওটা কিসের ডাক ?'

'হায়নার।' সহজ গলায় বলল সুখন।

'আপনি এখানে একদম একা-একা থাকেন ভয় করে না আপনার ?'

'কিসের ভয় ?' কোনোরকম বাহাদুরী না দেখিয়েই বলল সুখন।

তারপর বলল, 'আপনি একা থাকলেও ভয় করত না। থাকলেই অভ্যেস হয়ে যেত।'

তারপর কথা ঘুরিয়ে বলল, 'আপনি আশ্চর্য মেয়ে। এই রাতে বনের হায়নাকে ভয় পেলেন, আর এই অশিক্ষিত লোকটাকে, যে লোকটার সঙ্গে আপনার কোনো ব্যাপারেই, কোনোদিকেই মিল নেই, সেই মিস্ত্রীটার সঙ্গে রাতের বেলায় এখানে থাকতে ভয় পেলেন না ? আপনাকে সত্যিই বুঝতে পারলাম না। আপনি ভীষণ অন্যরকম।'

'আপনিও'—মহুয়া ভয় কাটিয়ে উঠে বলল।

সুখন বলল, 'আমি যদি আপনাকে নিয়ে ঐ সামনের গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যাই, তখন কি করবেন ?'

কিছুই করব না। স্পষ্ট গলায় মহুয়া বলল।

তারপরই বলল, 'পারবেন ? আমাকে নিয়ে সত্যিই পালাতে পারবেন ? তাহলে বুঝব আপনার সাহস কত ? আমি কিন্তু পালাতে পারি ! এমন সুন্দর জায়গা—আহা !'

'আশ্চর্য !' বলেই সুখন উঠে দাঁড়াল।

উঠে প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল। সুখনকে রীতিমত চিন্তিত দেখাচ্ছিল। ওর মনে হল, এমন চিন্তায় ও জীবনে আগে পড়েনি। ওর সমস্ত বুদ্ধি দিয়েও মহুয়াকে ও পুরোপুরি বুজে উঠতে পারল না। এই মুহূর্তে নিজেকেও না।

ও পায়চারি করতে লাগল বারান্দায় সিগারেট টানতে টানতে।

মহুয়া আড়চোখে দেখছিল সায়ান্ধকারে জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনটা একবার বাড়ছে আর একবার কমছে ?

সিগারেট খাওয়া শেষ করে, হঠাৎ আগুনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সুখন।

কালুয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘরের সামনে শুয়েছিল ও হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল --যেমন অদ্ভুত দীর্ঘশ্বাস একমাত্র কুকুররাই ফেলতে পারে।

কালুয়ার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই সুখন সহজ গলায় বলল, 'চলুন এবার যাওয়া যাক। আপনার বাবা ও কুমারবাবু চিন্তা করবেন। ইতিমধ্যেই ওঁরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই।'

মহুয়া বলল, এখন না। এখুনি আমি যাব না। আমি এখানে থাকব।'

তারপর হঠাৎ ধরা-গলায় আবার বলল, 'আমি এখানেই থাকব।'

সুখনের মনে হল, 'এখানেই' এবং 'থাকব' কথা দুটির উপর অস্বাভাবিক জোর দিল মহুয়া।

সুখন দৌড়ে এল মহুয়ার কাছে! এসে মহুয়ার চোখে খুব কাছ থেকে তাকাল।

মহুয়া ওর চোখে চাইল। অস্ফুটে বলল, 'আমি কিন্তু সত্যি-সত্যিই থাকব সত্যি।'

সুখন হেসে ফেলল। বলল, 'পাগলী। আপনি একেবারে পাগলী। কী যে বলেন, তার ঠিক নেই।'

মহুয়া রাগ করে, জেদ ধরে বলল, 'আমি যা বলছি, অনেক ভেবে বলছি।'

তারপরই বলল, 'আমাকে বুঝি আপনার অপছন্দ?'

সুখন ওর ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে ওর ঠোঁট বন্ধ করে দিল। বলল, 'এবারেই ঠিক বলেছেন।'

তারপর বলল, 'আপনাকে অপছন্দ করবার মত লোক কি কেউ আছে? কিন্তু আপনি কী বলছেন, আপনি জানেন না। আমি কি, কেমন লোক, কী পরিবেশে থাকি, কিরকম মিস্ত্রীগিরি করি সবই তো নিজের চোখে দেখলেন- তারপরও কি করে বলি যে, আপনি সুস্থ? আপনার সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

সুখন অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমাকে কষ্ট দিয়ে আপনার কি লাভ? কালই তো গাড়ি সারানো হয়ে গেলে চলে যাবেন—আমি যা, যেমন আছি, তাই-ই থাকব। আমি থেমে-থাকা গাড়ি সারাই—এই-ই আমার কাজ।'

তারপরই একেবারে চুপ করে গেল সুখন।

মহুয়া তেমনই দাঁড়িয়ে রইল ওর সামনে নিথর হয়ে।

দীর্ঘ নীরবতার পর সুখন বলল, 'সব গাড়িই সারানো হয়ে গেলে এক সময় ধুলো উড়িয়ে, হর্ণ বাজিয়ে চলে যায়। আমি যেখানে থাকার সেখানেই থাকি, থাকবও। আমার সঙ্গে এতবড় রসিকতা করবেন না। প্লিজ, আপনাকে বারণ করছি, এমন করবেন না।'

মহুয়া সুখনের কাছে সরে গিয়ে ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, 'কি? আমি রসিকতা করছি?'

মহুয়ার ছোট্ট কপালের মস্ত টিপটার অর্ধেক মুছে গেছিল, এক কোমর চুলের খোঁপাটা ভেঙে গেছিল—কপালের চুল লেপটে ছিল কানের পাশে। ওর নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠেছিল, চোখে

আগুন জ্বলছিল।

মহুয়া বলল, 'ভীতু ভীষণ ভীতু আপনি।'

সুখন কী করবে ভেবে পেল না। কী করবে, কেমন করে ওর অন্তরের তীব্র আনন্দ এবং অসহায়তা ও মহুয়াকে বোঝাবে তা বুঝতে পারল না।

সুখনের ইচ্ছে হল অনেক কিছু বলে, কিন্তু কিছুই না বলে ও চুপ করে রইল।

মহুয়া ঝাঁপিয়ে এসে সুখনের বুকে ওর নরম হাতের ছোট্ট ছোট্ট মুঠি দিয়ে বরাবর আঘাত করতে লাগল। বলতে লাগল, 'ভীতু, কাপুরুষ!'

সুখন কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

চাঁদটা আরো উপরে উঠেছে একটা হলুদ থালার মত। হলুদ চাঁদের আলোয় বিশ্বচরাচর ভরে গেছে। সন্ধের পর থেকেই যে ঠাণ্ডা হিম-হিম ভাবটা বনে-পাহাড়ে ভরে যায়, তাতে মহুয়া করৌঞ্জ আর শালফুলের গন্ধ মিশে গেছে। পাশ থেকে একটা কোকিল নাভি থেকে স্বর তুলে ডাকছে—কুহু-কুহু-কুহু-কুহু—দূর থেকে তার সঙ্গিনী সাড়া দিচ্ছে শিহর তুলে—কুহু-কুহু-কুহু।

সুখনের মাথার মধ্যে একজন মিস্ত্রী হাতুড়ি পিটিয়ে কোনো গাড়ির বাঁকা মাডগার্ড সিধে করছিল ক্রমান্বয়ে—হাতুড়ির পর হাতুড়ি মেরে।

সুখন সেই সুন্দরী হাওয়া-লাগা আমলকী বনের মত থরথর করে ভালবাসায় কাঁপতে থাকা সুগন্ধি মহুয়ার দিকে একবার ভাল করে চাইল! তারপরই তার হাত ধরে বলল, 'চলুন।'

সুখনের মনে হল, সে তার জন্মস্থানের গ্রহ-নক্ষত্রের নির্ভুল নির্বন্ধ-র দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। এই গন্তব্য যেন বহুদিন আগে থেকেই নির্দিষ্ট ছিল।

সুখন নিজেকে বুঝতে পারল না। সুখনের মনে হল, এই বড়লোকের বেড়াতে-আসা মেয়েটি—সুখনের অনেকানেক জমিয়ে রাখা অপমানের গ্লানি, অসম-ব্যবহারের ক্রোধ—এই সবকিছুকে নিবিয়ে ফেলার সুযোগ দিতে এসেছে।

সুখনের চোখ জ্বলে উঠল মুহূর্তের জন্য। ও আর মানুষ

নেই, ও হায়নার মত কোনো অশ্লীল জানোয়ার হয়ে গেছে বলে ওর মনে হল।

মহুয়া একটু ভয় পেল। বলল, 'কোথায় ?' বলেই ঘরের দিকে পা বাড়াল।

সুখন বলল, 'এখানে নয়, আপনি ঘরের মধ্যেব নন, আপনি যে মহুয়া—প্রকৃতির ; জঙ্গলের ; জঙ্গলের ; জঙ্গলে চলুন।'

মহুয়ার হাত ধরে পাহাড়ী ঘুরালের মত নেমে চলল সুখন পাকদণ্ডী দিয়ে নিচেব ঝর্ণার দিকে।

মহুয়া হাঁপাচ্ছিল, অমন খাড়াপথে নানা ওর অভ্যেস ছিল না। ওর হাঁটু, দু উরু উত্তেজনায়, নিষিদ্ধ ভালো-লাগায় একটু ভয়েও থরথর করে কাঁপছিল। সুখন ওকে এক ঝট্‌কায় কোলে তুলে নিল; তারপরই কাঁধে।

তারপর তরতর করে নেমে এল নদীব খোলে। সেখানে পেঁছেই মহুয়াকে নামিয়ে দিয়ে ওর দুই সবল হাতে মহুয়ার নরম মহুল ফুলের মত ছিপছিপে শরীর জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চুমু খেতে লাগল সুখন যে মহুয়ার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল। ছটফট করতে লাগল মহুয়া।

সুখন ওকে ছেড়ে দিতেই মহুয়া এতক্ষণের, হয়তো এত বছরের রুদ্ধ আবেগ ও মেয়েলি কামের তীব্র অথচ চাপা উচ্ছ্বাসে সুখনকে চুমুতে চুমুতে ভরে দিল।

মহুয়া থামলে, সুখন বলল, 'আসুন, সব কিছু খুলে আসুন।'

মহুয়া মুখ নামিয়ে, অন্যদিকে চেয়ে, লাজুক গলায় বলল, 'সব' ?

'হ্যাঁ, সব---কঠিন গলায় বলল সুখন।

সুখনের চোয়াল শক্ত হয়ে এল।

চাঁদের আলোয় সুখনের দিকে চেয়ে মহুয়ার মনে হল যে, এ লোকটাকে জানে না ও। একেবারে চেনে না।

মহুয়ার মনে হল, একটা নিরীহ, ঘুমন্ত বাঘকে গুহা থেকে বের করে এনেছে ও খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে। বাঘটা এবার বদলা নেবে। বাঘটার শরীরের পেশী ফুলে উঠছে, গলায় ঘড়ঘড়ানি শব্দ উঠেছে। বাঘটা বুঝি ওকে আঁচড়ে-কামড়ে রক্তাক্ত করে দেবে।

পাথরের মধ্যে কী যেন একটা পড়ার শব্দ হল। জিনিসটা

পড়েই পাথরে গড়িয়ে বালিতে থামল। সুখন তুলে নিল জিনিসটা। চাঁদের আলোয় গোলাকার পদার্থটা চকচক করছিল। —বলবেয়ারিং।

সুখন হেসে ফেলল। বলল, 'এ কি?

মহুয়াও লাজুক হাসি হাসল। বলল, 'বুকের মধ্যে রেখেছিলাম।'

'এত ভালবাসেন আপনি এগুলো? আপনি এখনও ছোটই আছেন। সত্যিই ছোট আছেন। আপনি মিছেই ভাবেন যে, আপনি বড় হয়ে গেছেন।'

তখন জঙ্গলের ভেতর থেকে, নদীর অববাহিকায় ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে একটা পিউ-কাঁহা পাখি ডাকছিল। ক্রমান্বয়ে ডেকেই চলছিল, পিউ-কাঁহা, পিউ-কাঁহা বলে। অন্য পাশ থেকে ঢাব পাখি ডাকছিল, গম্ভীর ভূতুড়ে গলায় ঢাব-ঢাব-ঢাব-ঢাব। পিউ-কাঁহার গলায় মহুয়া আর সুখনের আসন্ন মিলনের আনন্দ উড়ছিল, আর ঢাব পাখির স্বরে ওদের অসামাজিক নিষিদ্ধ সম্পর্কের গোপনীয়তা।

কালো পাথরের পাশে পেছন ফিরে দাঁড়ানো বিবসনা, চুলখোলা মহুয়াকে চাঁদের আকাশের পটভূমিতে দেখে সুখনের মনে হচ্ছিল যে, মহুয়াই পৃথিবীর প্রথম ও শেষ নারী। এই শালফুল, করৌঞ্জ আর মহুয়ার গন্ধের মধ্যেই ও জন্মেছিল, এরই মধ্যে ওর পরম পেলব পরিণতি।

সুখন নিজের বশে ছিল না। উচিত-অনুচিত বোধ, ভবিষ্যতের সব কথা ওর মস্তিষ্ক থেকে মুছে গেছিল।

সে-মুহূর্তে সুখনের মনে হচ্ছিল যে, নারীমাত্রই বুঝি মহুয়ার মত। তারা জন্মায়, হাসে, খেলে, তারা খেলায়; নিজেরা পূর্ণ হয়, পরিপ্লুত করে পুরুষকে। করেই, আবার চাঁদের আলোয় ফুলের গন্ধে ভাসতে ভাসতে অর্ণ্য পরিপ্লুতির দেশে, নতুন আবেশের আবেগের দেশে ভেসে যায়। নারীরা কাছে থাকে, বাঁচে ও বাঁচায়। পুরুষকে উজ্জীবিত করে, পুরুষের জীবনে নরম সুগন্ধি সব ফুল ফোটায়; কিন্তু তারা নিজেরা কখনও ফুরোয় না; ঝরে যায় না।

সাদা বালির মধ্যে হোলির চাঁদকে সাক্ষী রেখে, ফুলের গন্ধে

মন্থর বাতাসকে সাক্ষী রেখে, মহুয়া সুখেনের সঙ্গে এক দারুণ সুগন্ধি খেলায় মাতল।

খেলে, খেলিয়ে, আনন্দ দিয়ে, আনন্দ পেয়ে, ফুরিয়ে দিয়েই নতুন করে ভরিয়ে দিয়ে ওরা দুজনেই এক তীব্র ভালোবাসায় বিভোর হয়ে যেতে লাগল। করৌঞ্জের গন্ধের মত, চাঁদের আলোর মত ওরা একে অন্যের মধ্যে এবং দুজনে প্রসন্ন প্রকৃতির মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে গেল।

পাখিটা ডেকেই চলল, পিউ-কাঁহা, পিউ-কাঁহা পিউ-কাঁহা।

মহুয়া অস্ফুটে বলল, 'সুখ, আপনি কোথায়? আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

সুখন মহুয়ার চোখে চুমু খেল। ফিসফিস করে বলল, 'এই তো আমি, আমি এই যে!'

তারপর ওর ঠোঁটে ঠোঁট নামিয়ে এনে বলল, সুখকে দেখা যায় না! শুধু অনুভব করতে হয়।'

ক্ষণকালের জন্য মহুয়ার মন একেবারে অসাড় হয়ে গেছিল। সমস্ত সাড় তখন তার শরীরেই শুধু দাপাদাপি করে ফিরছিল। এমনটি ওর জীবনে আর কখনও হয়নি।

উপরে তারা-ভরা, চাঁদ-ওড়া আকাশ, ঝুঁকে-পড়া শালবন, ঝিঁঝিদের ঝিন্‌ঝিনি।

তখন চতুর্দিকে রাত ঝরছিল, চাঁদ ঝরছিল; মহুয়ার শরীরের ভেতরে মহুয়া ঝরছিল ধীরে-ধীরে। ফিস্‌-ফিস্‌-ফিস্‌-ফিস্‌-ফিস্‌।

॥ পাঁচ ॥

একটা চ্যাটানো চওড়া পাথরে সুখনের পাশে পা ঝুলিয়ে বসেছিল মহুয়া। একটা একলা টিটি পাখি টিটির-টি-টিটির-টি করে ডাকতে ডাকতে জঙ্গলের গভীরে উড়েছিল।

ওরা কতক্ষণ যে অমন করে বসেছিল তা ওদের দু'জনেরই হুঁশ ছিল না কোনো।

অনেকক্ষণ পর যেন স্বপ্নোত্থিতের মত মহুয়া বলল, 'শুনুন।'

সুখন বলল, উঁ...।

—এখানেই থাকা হবে ?

—থাকুন। আপনি তো বললেন চিরদিন থাকবেন।

- বলেছিই তো !

—জানি।

—কি জানেন ?

—বলেছিলেন যে, সে কথা।

—আপনার কি এখনও সন্দেহ আমাকে ?

—আপনাকে ? না, না। আপনাকে সন্দেহ নয়।

—তবে ?

সুখনের মনে এখন বড় প্রশান্তি। এত সুখ এত শান্তি ও জীবনে আগে কখনও জানেনি ! পৃথিবীর সব অশিক্ষিত পয়সা-ওয়ালা গাড়ি-চড়া খদ্দেরদের ও ক্ষমা করে দিল। এই মুহূর্তে সুখন বড় উদার, মহৎ ; সুখী মানুষ।

মহুয়ার প্রশ্নের উত্তরে সুখন বলল,'আমাকে আমি চিনি না।'

আমি চিনি।

চেনেন ? ভাবতে ভালো লাগছে যে, আমাকে কেউ, অন্তত একজনও চেনে।

তারপরই বলল, 'চলুন। ক'টা বাজে বলুন তো ?'

আটটা। রেডিয়াম দেওয়া হাতঘড়িতে দেখে বলল মহুয়া।

তারপর বলল, 'যেতে ইচ্ছে করছে না।'

ও উঠে দাঁড়াতেই কালুয়া পাথরের আড়াল থেকে কুঁই-কুঁই করে ডেকে উঠল।

সুখন মহুয়ার শাড়ি থেকে বালি ঝেড়ে দিতে দিতে বলল, 'দেখছেন, কালুয়াটার কিরকম ঈর্ষা। মেয়েরা, মানে মেয়ে মাত্রই ঈর্ষাকাতর।'

মহুয়া বলল, 'আমি কি শুধু কোনো কুকুরীরই ঈর্ষার পাত্র ?'

সুখন হাসল। বলল, 'যেমন আপনার রুচি। সুখন মিস্ত্রীকে যার ভাল লাগল তাকে ঈর্ষা করবে আর কে ?'

মহুয়া উমমু—মমু করে একটু মিথ্যে আপত্তি জানাল।

সুখন বলছিল, নিজের মনেই—তুমি বড় সুন্দর মহুয়া।

সত্যিই তোমার মত সুন্দর কিছুই আমি দেখিনি জন্মের পর থেকে।

দেখতে দেখতে ওরা শাকুয়া-টুঙ এ উঠে এল।

সুখন বলল, 'জানেন, আমি মিস্ত্রীদের বলি যে, আমি মরলে এখানে আমাকে কবর দিয়ে রাখতে। ওরা বলেছে দেবে। ভাবছি, এখন থেকেই এ জায়গাটাতে অনেকগুলো মহুয়া গাছ লাগিয়ে রাখব।'

মহুয়া রাগত গলায় বলল, 'থাক্, অন্য কথা বলুন।'

সুখন বলল, হ্যাঁ, যা যা কথা আছে বলে ফেলুন। সময় খুব কম। সময় বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।

মহুয়া আবার বলল, আশ্চর্য, আপনি এখনও আমাকে সিরিয়াসলি নিলেন না? আরো কিছু কি চান আপনি আমার কাছে?'

বাইরে থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, 'কিছু না। যা দিয়েছেন, সেটুকুর দামই দিতে পারব না এ জন্মে। আর কি চাইব?'

মহুয়া চুপ করে রইল।

মনে মনে বলল, যে-দামের কথা সুখন বলছে তার দাম কিছুই নয়। যা ওকে মহুয়া সত্যিই দিয়েছে তার দাম কি ও কখনও বুঝবে?

ওরা শাকুয়া-টুঙ-এর টিলা ছেড়ে নীচের শালবনে নেমে এল। তারপর পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

সুখন মহুয়ার হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিল।

বলল, 'আপনার হাতের আঙুলগুলো কি সুন্দর! আপনার সব সুন্দর।'

মহুয়া জবাব দিল না। বলল, 'আমি একটা কথা ভাবছি।'

—কি কথা? বলুন?—সুখন মুখ তুলে বলল।

মহুয়া অনেকক্ষণ দ্বিধা করল। তারপর বলল, 'যদি কিছু হয়?

সুখন প্রথমে বুঝতে পারেনিনি মেয়েলি কথাটা। বুঝতে পেরে বলল, 'কিছু হবে না'!

—আহা আপনি যেন সব জানেন!

—সব জানি না। তবে আমার মন বলছে, কিছুই হবে না।

—তবুও যদি কিছু হয়ে যায়!

—আপনার এখন ভয় করছে বুঝি? খারাপ লাগছে?

—ভয় নয়। খারাপ তো নয়ই। কিরকম অবাক লাগছে।

—স্বাভাবিক। কি করে যে হঠাৎ ব্যাপারটা ঘটে গেল, আমিও বুঝে উঠতে পারছি না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি কি চান?'

—মানে?—

—মানে, কি—ছেলে না মেয়ে?

—মহুয়া লজ্জা পেল। মুখ ঘুরিয়ে নিল।

সুখন অবাক হল।

মেয়ে সত্যিই বোঝা মুশকিল। কিসে যে লজ্জা পায়, আর কিসে যে পায় না!

একটুক্ষণ পর মহুয়া লাজুক গলায় বলল, 'ছেলে'।

তারপরই বলল, 'ঠিক আপনার মত।'

সুখন স্বগতোক্তির মত বলল, 'যদি ছেলে হয় তার নাম রাখবেন পলাশ।'

পলাশ? মহুয়া মুখ তুলে তাকাল।

—পলাশ ভালো না?

—ভালো। খুব ভালো। মহুয়া বলল।

—আর যদি...? মহুয়া শুধোল।

—মেয়ে হলে তার নাম রাখতে পারেন—টুঁই।

—টুঁই?

—হ্যাঁ। টুঁই। টুঁই পাখি দেখেননি। টিয়ার মত। কিন্তু খুব ছোট্ট পাখি—নরম কোমল কচি-কলাপাতা-সবুজ তার গায়ের রঙ, চিকন গলায় ডাকে, টিঁ-টুঁই-টুঁই-টিঁ-টুঁই-টিঁ-টুঁই। প্রাণে ভরপুর। গাছের চারায় চারায় উড়ে বেড়ায়—ছটফটে—মিষ্টি। কোথাও একদণ্ডের বেশি স্থির হয়ে বসে না।

—বাঃ, বেশ নাম তো!

জঙ্গলটা পেরিয়ে আসতেই দূরের বড় রাস্তায় চোখ গেল ওদের।

আলো-জ্বালা একটা বাস হুস্-স্ করে চলে গেল রাঁচীর দিকে।

—এই রে!—বলল সুখন।

তারপর বলল, কপালে খুব গালাগালি আছে আপনার বয়-ফ্রেণ্ডের কাছে।

'কেন?' সন্ত্রস্ত চোখে মহুয়া তাকাল।

—মনে হচ্ছে বাস স্ট্রাইক মিটে গেছে। সকাল থেকে আমি উধাও। শাকুয়া-টুঙে চলে না গেলে এতক্ষণে তো আপনাদের গাড়ি ঠিক করে দেওয়া যেত। তাহলে আর আপনাদের এতক্ষণ কষ্ট করে ফুলটুলিয়ায় থাকতে হতো না। এত বড় দুর্ঘটনা থেকেও হয়তো বেঁচে যেতেন আপনি।

মহুয়া প্রথমে জবাব দিল না কথার। তারপর বলল, 'দুর্ঘটনা বলছেন কেন?'

না। এমনিই বললাম। সুখন বলল।

একটু পর মহুয়া বলল, 'আমরা দুজনে কি একসঙ্গে বাড়ি ফিরব।'

এই কথাটার সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণের এই কয়েক ঘণ্টার পরজবসন্ত আবহাওয়াটা উধাও হয়ে গেল। কেমন বেসুর, বেতাল। ওরা দুজনেই একই সঙ্গে বুঝতে পারল যে, ওদের ছাড়াছাড়ি হওয়ার সময় হয়েছে। জঙ্গলে অনেক কিছু হয়, কিন্তু শহরে হয় না। জঙ্গলের সত্য এখানে মিথ্যা। সব মিথ্যা।

সুখন বলল, 'একসঙ্গে বাড়ি ঢুকতে আমার আপত্তি নেই, ভয়ও নেই। তবে আপনার দিক থেকে বোধহয় সেটা ঠিক হবে না। জঙ্গলের যাদুর বশে জংলী লোকের সঙ্গে যা ব্যবহার করেছেন, এই লোকালয়ে, আপনার বাবার সামনে, বয়-ফ্রেণ্ডের সামনে তো তেমন করলে চলবে না। জঙ্গলের গন্ধ জঙ্গলেই থেকে যাবে। সেই জঙ্গলের মধ্যের ঝর্ণার বুকের মহুয়া, আর যে-মহুয়া সকালে চলে যাবে সে তো এক নয়!

মহুয়া মুখ ঘুরিয়ে একবার সুখনকে বলল, 'আমরা একসঙ্গেই যাব।'

না। আমরা একসঙ্গে যাব না।—সুখন বলল।

ততক্ষণে ওরা দহটার পাশ দিয়ে বাঁধের উপরে এসে পৌঁচেছে। পেছনে ফেলে আসা জঙ্গলের শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ সমস্তই সেই চন্দ্রালোকিত রাতে এক মোহময় স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে!

সুখন জানে যে, সেই স্বপ্নে সে আবার ফিরে যাবে। রোজই

ফিরে যাবে। কারণ জঙ্গলের মধ্যেই তার জীবন, তার জীবনের অঙ্গ এই স্বপ্ন। কিন্তু মহুয়া আর কখনও এখানে ফিরবে না। ফিরতে পারবে না। কালি পোকা যেমন আলোর দিকেই ওড়ে, তেমনই শহুরে পরিবেশের কাছাকাছি এসে মহুয়া ওর ভেতরে নিশ্চয়ই একটা প্রবল প্রত্যাবর্তনের তাগিদ অনুভব করছে। বড়লোকের সুন্দরী মেয়ের এক ক্ষণিক খুশির খেয়ালে সুখন মিস্ত্রীকে তার ভাল লেগেছিল, জঙ্গলের আবেশে তার নেশা ধরেছিল, শহরে ফিরলেই সে যে সমাজের লোক সেই সমাজে পৌঁছলেই পুরো ব্যাপারটাকে – মহুয়া "আ গ্রেট ফান, অর এ্যান এ্যাকসিডেন্টাল এপিসোড" ছাড়া অন্য কিছুই হয়তো ভাববে না।

এই মুহূর্তে সুখনের বুকে ভারী একটা চাপা কষ্ট হচ্ছিল। সুখন জানে যে, এই কষ্টটা বেশ কিছুদিন তাকে পেয়ে বসবে; চেপে থাকবে বুকে ভারী পাথরের মতন। একটা গভীর ক্ষতর মত দগদগ করবে অনেকদিন। যখনই বাতাসে মহুয়ার গন্ধ পাবে ও, তখনই এই রক্তমাংসের নরম মিষ্টি এক-কোমর চুলের, দীঘল কালো চোখের মহুয়ার কথা মনে পড়বে। তারপর একদিন সবই ঠিক হয়ে যাবে। রুখু বাতাসে, টান আবহাওয়ায়, ক্ষতটা একদিন শুকিয়েও যাবে। যদি তাড়াতাড়ি না শুকোয়, তখন বোতল বোতল মহুয়ার মদ ঢালবে গলায়—বিশল্যকরণী। তবু সুখন এও জানে যে, ক্ষত শুকোলেও ক্ষতর দাগটা থেকেই যাবে।

সুখন মহুয়ার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল যে মেয়েরা যত সহজে সবকিছু ভোলে নিজেদের স্বার্থে; নিজেদের প্রয়োজনে —পুরুষরা অত সহজে পারে না।

সুখন ওর জীবনে বেশি মেয়ে দেখেনি; কিন্তু যে-ক'জনকে দেখেছে, গভীরভাবে, মনোযোগের সঙ্গে, অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছে। তাদের দেখে সুখনের এই ধারণাই হয়েছে যে, যাযাবর বৃত্তিতে মেয়েদের কাছে বেদেরাও লজ্জিত হয়।

ঘোর কাটিয়ে সুখন বলল, 'মহুয়া, একটু দাঁড়ান!'

মহুয়া ওর দিকে ফিরে দাঁড়াল।

সুখন ওকে বুকে টেনে নিল। নিয়ে চুমোয় চুমোয় ভরে দিল। ওর সুন্দর পাহাড়ী-ঘুঘুর মত বুকের সন্ধিস্থলে নাক ডোবাল।

মহুয়ার চোখ দুটি বড় সুন্দর। এমন আবেশ-ভরা দৃষ্টি সুখন কখনও দেখেনি ; হয়ত আর দেখবেও না।

মহুয়া আবেশে চোখ বুজে রইল। তারপর সুখনের দাম সুখনকে ফিরিয়ে দিল। সুখনকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'সাধ মিটেছে ?'

সুখন হাসল। বলল, 'সাধ কি মিটবার ?'

তারপরই কেজো-গলায় বলল, আপনি এইদিক দিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় উঠুন। তারপর সামনে দিয়ে বাড়িতে ঢুকুন। কোন ভয় নেই। তবুও আপনি ভয় পেতে পারেন বলেই আপনাকে লক্ষ রাখব। আপনি বাড়ি ঢুকে যাবার একটু পর আমি যাব—পিছনের দরজা দিয়ে। কেমন ?

মহুয়া সামনের দিকে পা বাড়াল। সুখন তার ডান হাতটি নিজের ডান হাতে তুলে নিয়ে চুমু খেল। নরম গলায় বলল, 'আসুন মহুয়া।'

মহুয়া থমকে দাঁড়াল। মুখ নামিয়ে নিল। বলল, আসি।

সুখন দেখতে পাচ্ছিল টর্চ হাতে কারা যেন এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে। হয়তো সান্যাল সাহেবরা। ওদের পক্ষে চিন্তিত হওয়া স্বাভাবিক।

মহুয়া চাঁদ-ভেজা অসমান জমি বেয়ে নিজস্ব পা-ফেলার অভিজাত ছন্দে হেঁটে যাচ্ছে বড় রাস্তার দিকে। লতানো হাতে জড়িয়ে খোঁপাটা বেঁধে নিয়েছে। ওর ছিপছিপে শরীর একটা আলতো সুগন্ধি ছায়ার মত সরে যাচ্ছে—দূরে- ক্রমাগত দূরে ; অন্য ছায়াদের গভীরে।

কালুয়াটা সুখনের পায়ের কাছে বসে মহুয়ার দিকে মুখ তুলে চেয়েছিল।

সুখন সিগারেট ধরিয়ে একদৃষ্টে সেই অপস্রিয়মান ছায়াটির দিকে চেয়ে রইল।

পেছনের খোওয়াই-এর উপরে একটা একলা টিটি পাখি ডেকে ফিরছিল।

সুখন মিস্ত্রী জীবনে কখনও এত দুর্বল বোধ করেনি এর আগে। এত মঙ্গলকামনায়, এত শুভভাবনায় ভরপুর হয়ে চলে-যাওয়া কারও পথের দিকেই এমন করে আর তাকায়নি সে।

হঠাৎ সুখন অনুভব করল তার চোখের কোল ভিজে গেছে।

হঠাৎ সুখন এক ঝটকায় সিগারেটটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল এই মিস্ত্রী! হচ্ছে কি! এটা কি হচ্ছে? শালা। বাঁদর হয়ে চাঁদে হাত। চল্ শালা, আর্মেচারে তার জড়াবি। ডিস্ট্রি-বিউটরের কার্বন পরিষ্কার করবি।

জীবনে এই প্রথমবার সুখনের মনে হল, ওর মনের ডিস্ট্রি বিউটরেও বড় ময়লা জমেছে। ভাল করে খুলে ওটাকে একদিন পরিষ্কার করতে হবে প্লাগগুলো থেকেও ঘষে ঘষে কার্বন তুলতে হবে।

ও জানে যে, রোম্যাণ্টিক রঙ্‌বাজী সুখন মিস্ত্রীকে মানায় না। মানাবে না কোনদিনও।

।। ছয় ।।

কুমারের যখন ঘুম ভেঙেছিল, তখন বেলা পড়ে এসেছিল।

ঘর থেকে বারান্দায় এসে মোড়ায় বসল কুমার।

ওকে উঠতে দেখে মংলু চা বানিয়ে দিল, সঙ্গে হালুয়া আর পাঁপর-ভাজা।

এইসব হালুয়া-মালুয়া দিশী খাবার পছন্দ করে না কুমার। কেমন পিছলে-পিছলে যায়। যখনই ও হালুয়া খেয়েছে—এই সঙ্গে 'লে-হালুয়া' কথাটার কি সম্পর্ক ও ভাববার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভেবে পায়নি।

চা খেতে খেতে একটা বিলিতি লম্বা সিগারেট ধরাল কুমার। মংলুকে শুধোল, 'এই ছোকরা, তোর ওস্তাদ কোথায়?'

মংলু বলল, জানি না।

—দিদিমণি কোথায়?

—বেড়াতে গেছেন।

—আর বুড়ো বাবু?

—উনিও বেড়াতে গেছেন।

—একই সঙ্গে দু'জন?

—না। আলাদা, আলাদা। আগে, পরে।

কুমারের মাথার মধ্যে 'লে-হালুয়া' কথাটা ফিরে এল।

তারপরই আবার ও মংলুকে জেরা করল, একই দিকে ?

'জানি না ' দেখিনি।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল মংলু।

কুমার আর সময় নষ্ট করল না। পায়জামা পরে শুয়েছিল। ছেড়ে ফেলে জামা-কাপড় পরে নিল। ইমপোর্টেড হলুদ কাপড়ের ট্রাউজার আর ঘন বেগুনী-রঙা গেঞ্জী। পোশাক পরে আয়নার সামনে দাঁড়াল।

মনে মনে বলল—এমনই মিস্ত্রী, ঘরে একটা ভদ্রগোছের আয়নাও রাখতে পারেনি। অবশ্য কিসের জন্যই বা রাখবে? অমন চাঁদবদন দেখার আর কি আছে ?

আয়নার সামনে দাঁড়াতে খুব একটা পছন্দ করে না কুমার। ওর চেহারাটা দিন-কে-দিন গুড়ের হাঁড়িতে পড়া নেংটি ইঁদুরের মত গুড়-চুক্ চুক্ অথচ পাকানো হয়ে যাচ্ছে। এত পরিমাণে মদ্যপান করছে প্রতিদিন যাতে গায়ে-গতরে একটু লাগে, কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হচ্ছে না। অফিসে ওর যত ভার বাড়ছে, পদ বাড়ছে, ওর শরীরের ভার যেন ততই কমছে। এ-একটা প্যারাডক্স। কিছুই করার নেই।

কুমার বেরিয়ে মহুয়া যেদিকে গেছে বলে জানিয়েছে মংলু, সেদিকে হাঁটতে লাগল রাস্তা ধরে।

রাস্তায় যানবাহন কিছু নেই। কাঁচা লাল ধুলোর রাস্তা। সামনেই একটা নালা। তার উপর কজ-ওয়ে। গাছ-গাছালির বুনো-বুনো গন্ধ, পাথর-মাথর, রাজ্যের বোগাস জিনিস।

একটা মোষের গাড়ি চলেছে ক্যাচোর-কোঁচর করতে করতে। মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হয় আওয়াজে।

মনে মনে বিরক্তির পরাকাষ্ঠা ঝরিয়ে কুমার ভাবল, এমনই জায়গা যে, একটা তেমন পানের দোকানও নেই যেখানে সোডা পাওয়া যায়। আজ রাতে তো করার কিছুই নেই। বুদ্ধ ভাম তো মেয়ে সামলে সামলেই গেল। এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করে না মহুয়াকে। এখানে মানে কলকাতার বাইরে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মহুয়ার সঙ্গে একটি শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনা। আনলেস্ শী ইজ্ গুড ইন বেড, মহুয়াকে বিয়ে করবে না

কুমার। ওসব মন-ফন, আজকের মেট্রিক সিস্টেমের দিনে কনডেমড্ ব্যাপার। এখন শরীরম্ আদ্যম্। এ-ব্যাপারে মিল না হলে, খামোখা বিয়ে-ফিয়ের ঝামেলার মধ্যে যাবে না ও। তারপরই ভাবল সত্যিই কি যাবে না?

কুমার ভাবছিল, মেয়েটাও যেন কেমন। পাদি-পিসী পাদি-পিসী ভাব। এ নিয়ে কিসের এত ফাসস্ করা তো এরকম নেকুপুষু-মুনু মেয়েরাই জানে।

হঠাৎ কুমার দেখল যে, সান্যাল সাহেব উল্টোদিক থেকে আসছে হন্তদন্ত হয়ে। বীয়ার টেনে-টেনে তলপেটটা তরমুজের মত করেছে বুড়ো।

কুমার ওঁকে দেখে কজ্-ওয়েটার উপরে দাঁড়াল। মোষের গাড়িটা হেভী ধুলো উড়োচ্ছে। এগিয়ে যাক ওটা। তাছাড়া মোষেদের গায়ে একটা বোঁটকা গন্ধ। বুড়ো চান করে বেরোবার পর বাথরুমে এরকম একটা গন্ধ পেয়েছিল কুমার।

সান্যাল সাহেবের হাতে একটা বাঁশের লাঠি। খাকি শর্টস। গায়ে সাদা কলারওয়ালা গেঞ্জী। অনেকখানি হাঁটাতে, ঘামে কপাল মুখ সব একরকম ভিজে গেছে।

সূর্য হেলে গেছে পশ্চিমে, অথচ এখনও পাথর থেকে গরমের ঝাঁজ বেরোচ্ছে। হরিবল্ জায়গা।

সান্যাল সাহেব কাছে এসেই বললেন, বড় চিন্তার কথা হলো।

কুমার ঠাণ্ডা, ইমপার্সোনাল গলায় বলল, কি?

—মহুয়া কি ফিরেছে?

না তো।—কুমার বলল।

—সেই বিকেলে নাকি বেরিয়েছে। কোথায় গেল, কোনদিকে গেল কিছুই বলে যায়নি। প্রায় দু' আড়াই ঘণ্টা হতে চলল। এখুনি সন্ধে হয়ে যাবে। কি করি বল তো?

সান্যাল সাহেবের গলায় চিন্তার রেশ ছড়িয়ে পড়ল।

কুমার বলল, সেই মিস্ত্রী ব্যাটা কোথায়?

—সে তো তুমি গালাগালি করবার পরই বেপাত্তা। ঐ ছোকরা চাকরটা বলল যে, ও নাকি খেতেও আসেনি।

'ওরই কনস্পিরেসী নয় তো? মহুয়ার যা সফট্-কর্ণার দেখছিলাম ঐ মিস্ত্রীর জন্য।' চিবিয়ে চিবিয়ে কুমার বলল।

—আহা! কি যা-তা বল কুমার। উই শুড নট ফরগেট দ্যাট আফটার অল শী ইজ মাই ডটার। তুমি এমন কথা বলছ বা ভাবছ কি করে?

কুমার বলল, 'আমি কিছু ভাবছি যা বলছি না। আপনাকে ভাবতে বলছি। আফটার অল শী ইজ ইয়োর ডটার। আমার কে?

কথাটা বলে এবং বুড়োকে আরো একটু দুশ্চিন্তার ফেলে, কুমার খুশি হল। ও লক্ষ করেছে চিরদিনই যে, লোককে আঘাত করে ও ভীষণ আনন্দ পায়। বাক্যবাণে লোককে বিদ্ধ করার আর্টটা ও দারুণ রপ্ত করেছে। সত্যি কথা বলতে কি ওর ইচ্ছে আছে যে, এই আর্টটা ও কমপ্লিটলি মাস্টার করে ফেলবে।

চিন্তান্বিতভাবে সান্যাল সাহেব আগে আগে এবং কুমার পেছনে পেছনে আবার সুখনের ডেরায় ফিরলেন।

সান্যাল সাহেব আশা করেছিলেন যে, ফিরে এবার মহুয়াকে দেখতে পাবেন। দেখবেন মহুয়া গা-টা ধুয়ে শাড়ি বদলে বারান্দায় বসে পড়েছে। মেয়েকে সান্যাল সাহেব বড় ভালবাসেন। তাছাড়া স্ত্রীর বিকল্পও বটে। মানে, ওর অত বড় ফ্লাটে একজন নারীর বিকল্প। মহুয়ার জন্য যত বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন তিনি, তত বেশি করে বুঝতে পারেন মহুয়াকে তিনি ঠিক কতখানি ভালবাসেন।

উঠোনে পেঁছেই তিনি শুধোলেন, 'কি রে? আসেনি এখনও দিদিমণি?'

না। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল মংলু।

এই উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মংলুর মুখেও চিন্তার ছাপ দেখা দিল। দিদিমণি এতখানি দেরি করবে বলে বুঝতে পারেনি মংলু। যদি কোনো বিপদ-আপদ হয়, সাপে কামড়ায়, ভাল্লুকে খোবলায়, দায়িত্ব পড়বে মংলুর ঘাড়ে। যদি কেউ দেখে থাকে যে মংলুর সঙ্গে দিদিমণি শাকুয়া-টুঙের দিকে গেছে, তাহলে গুঞ্জার দারোগা বাবু এসে নির্ঘাৎ ওকে হাত-কড়া লাগিয়ে থানায় নিয়ে যাবে, তারপরে মারের চোটে বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেবে।

সুখনের কারখানার রঙের কাজ করে যে মিস্ত্রী, তার বাড়ি কারখানার কাছেই। সান্যাল সাহেবের পীড়াপীড়িতে মংলু তাঁকে নিয়ে তার বাড়ি গেল।

কুমার বলল, 'আমি এখানেই থাকি। যদি মহুয়া এসে পড়ে তবে একা পড়ে যাবে। তাছাড়া আমি একটু ভেবে দেখি যে, কি করা যায়, কি করা উচিত। একটা এ্যাকশান প্ল্যান।'

সান্যাল সাহেব দিশেহারা হয়ে গেছেন। রাত অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। যদিও চাঁদের আলো আছে ফুটফুটে, তবুও অচেনা-অজানা বুনো জায়গা। কোথায় গেল? কি হল মেয়েটার?

রঙের মিস্ত্রী সবে জামা-কাপড় ছেড়ে গামছা পরে, লুঙ্গি আর গোলা-সাবান নিয়ে কুয়োতলায় যাচ্ছিল, এমন সময় মংলুর সঙ্গে সান্যাল-সাহেব গিয়ে হাজির।

সব শুনে মিস্ত্রী বলল, 'এখানে তো ভয়ের কিছু নেই, তবে জঙ্গলের দিকে সাপের ভয় আছে। গরমের দিনে মহুয়ার সময় ভালুকের ভয়ও আছে। কিন্তু—দিদিমণি জঙ্গলে যাবেনই বা কেন একা একা? খারাপ লোকের ভয় এখানে নেই। আজ হাটবারও নয়। হাটের দিনে লোকে একটু মহুয়া-টহুয়া পাচানি-খায়—তখন অনেক সময় মাতাল হয়ে মেয়েদের উপর হামলা-টামলা করে। কিন্তু আজ তো হাটবারও নয়।

তারপর আশ্বাস দিয়ে বলল, 'যাই হোক বাবু, আপনি যান, আমি তো বাড়িতেই আছি। রাত দশটা পর্যন্ত না ফিরলে আমাকে খবর দিবেন। থানায় নিয়ে যাবো আপনাদের।'

সান্যাল সাহেব বললেন, 'যাবে কিসে করে? বাস তো স্ট্রাইক! এখানে ট্যাক্সী পাওয়া যাবে?'

'বাস স্ট্রাইক তো বিকেল চারটেয় মিটে গেছে। বিকেলে বাস গেল দেখলেন না আপনারা?'

অবাক গলায় সান্যাল সাহেব শুধোলেন, মিটে গেছে? আশ্চর্য।

তারপর বললেন, তাহলে তো আমরা আজই গাড়ি সারিয়ে চলে যেতে পারতাম।

রঙের মিস্ত্রী বলল, 'তা পারতেন। কিন্তু আপনার সঙ্গের বাবু ওস্তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেন বলে ওস্তাদ রাগ করে চলে গেল। উনি থাকলে তো সবই হয়ে যেত। ঐ বাবু খারাপ ব্যবহার করেছে শুনে মিস্ত্রীরা বলছিল বাবুকে মারবে।

তা ওস্তাদই ওদের বকল। বলল, একদিনের মেহমান ; ক্ষমা করে দে।'

সান্যাল সাহেব এক মুহূর্তে মহুয়ার কথা ভুলে গিয়ে বললেন, তা তোমার ওস্তাদ গেলেন কোথায় ?

—কে জানে কোথায় ? ওস্তাদের কথা ! পড়োলিখি আদমী। মিস্ত্রী হলে কি হয়। মাথায় অনেক পোকা আছে। বোধহয় শাকুয়া-টুঙে বসে পড়া-লিখা করছে।

—সেটা আবার কি ?

—ওই টিলার উপরে ওস্তাদের আস্তানা আছে একটা। চলে যায় সেখানে রাগ-টাগ হলে ছুটিছাটার দিনে।

সান্যাল সাহেব মহা বিপদেই পড়লেন ? ফেরার পথে সান্যাল সাহেব মংলুকে শুধোলেন, 'এই শাকুয়া-টুঙটা কোন্‌দিকে রে ? তুই চিনিস ?'

রঙের মিস্ত্রীর কথা শুনে এমনিতেই মংলুর টাগরা শুকিয়ে গেছিল। এবার শুকোল।

—বলল, 'চিনি। কিন্তু ওস্তাদ ওখানে যাননি।'

—কি করে জানলি যে, যাননি ?

—গেলে আমি জানি, গেলে আমাকে বলে যান, জিনিসপত্র নিয়ে যান।

'অ…।' বললেন সান্যাল সাহেব।

ডেরার কাছে এসে অনেকক্ষণ এ-পাশে ওপাশে ঘুরে ঘুরে তারস্বরে মহুয়া মহুয়া বলে ডাকলেন।

চাঁদনি রাতের বন-পাহাড়ে সে ডাককে ফিরিয়ে দিল বারে বারে গম্ভীর স্বরে সান্যাল সাহেবের ক্লিষ্ট বুকে ; কিন্তু মহুয়া সাড়া দিল না।

বারান্দার সামনে এসে সান্যাল সাহেব দেখলেন যে, কুমার টুলের উপর হুইস্কীর বোতল রেখেছে—নিজেই কোথা থেকে জলটল জোগাড় করে একা একা বসে হুইস্কী খাচ্ছে।

অত্যন্ত উত্তেজিত গলায় উনি বললেন, 'তুমি হুইস্কী খাচ্ছ ? ভাঙা গাড়িতে আমাদের ভুল রাস্তায় এনে এমন বিপদ ঘটিয়ে, আমার মেয়েটার এমন সর্বনাশ করে এখন তুমি কোন্ আক্কেলে হুইস্কী খাচ্ছ ?

কুমার আরেকটা মোড়া এগিয়ে দিয়ে বলল, বসুন, বসুন।' বলেই একটা বড় হুইস্কী ঢেলে ওঁকে দিয়ে বলল, 'আরো একটু দেখুন। তারপর যা করার করতে হবে। সার্চ পার্টি অর্গানাইজ করে চারদিকেই বেরেনো যাবে। এখনও তার সময় হয়নি। তাছাড়া নিন—এটা এক গাল্পে শেষ করুন--উই উইল ফীল বেটার।

তারপর একটু থেমে বলল, "দেয়ারস্ নো পয়েণ্ট ইন্ ট্রায়িং টু ডু সামথিং, হোয়েন দেয়ারস্ নাথিং টু বী ডান্", ডক্টর চেসারের একটা বইয়ে পড়েছিলাম। নিন, হ্যাভ্ অ্যানাদার ওয়ান। কুইক্।'

সান্যাল সাহেব দিশেহারা, হতাশ অবস্থায় কুমারের কথা মত পর পর দুটো বড় হুইস্কী খেয়ে ফেললেন।

তারপর বললেন, তোমার কি মনে হয় কুমার ?

কুমার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, আমার মনে হয় আর আধ ঘণ্টার মধ্যে মহুয়া ফিরে আসবে। তার একটু পরেই সুখন মিস্ত্রী। আর আমার যা মনে হয়, তা ঠিকই মনে হয়। চিরদিনই।

তারপর সান্যাল সাহেবকে অভয় দিয়ে বলল, 'আপনি হুইস্কী খান, হুইস্কী খেতে খেতে দেখুন মহুয়া আসে কি না।'

সান্যাল সাহেব উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রইলেন। কুমার সান্যাল সাহেবকে প্রায় জোর করেই একটার পর একটা হুইস্কী খাইয়ে যেতে লাগল। কিন্তু নিজে অতটা খেল না। কুমারের মাথার মধ্যে পুঞ্জীভুত রাগ এবং প্রতিশোধের স্পৃহা একটা সামুদ্রিক কাঁকড়ার মত দাঁড়া নাড়তে লাগল।

হঠাৎ উঠোনের দরজায় আওয়াজ হল। সান্যাল সাহেব, কুমার মংলু সকলেই একই সঙ্গে মুখ তুললেন ও তুলল।

মহুয়া দাঁড়িয়েছিল। চুল এলোমেলো, শাড়ি ক্রাশড্। টিপ ধেবড়ে গেছে। মুখের মধ্যে অপরাধ ও ভয় মেশানো একটা আনন্দের ছাপ।

কুমারের মনে হল, আনন্দের ছাপটাই প্রধান।

সান্যাল সাহেব এতক্ষণ মেয়ের শোকে পাগল হয়েছিলেন। ভাবছিলেন, মহুয়া ফিরলে মহুয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন। কিন্তু মহুয়া তাঁর চোখের সামনে এসে দাঁড়াতেই বহু বছর আগে

দেওঘরের শালবনের মধ্যে ভর দুপুরে দেখা একটি মেয়ের মুখ তাঁর মনে পড়ে গেল। সান্যাল সাহেবের বুঝতে ভুল হল না যে মহুয়া সেই মায়েরেই মেয়ে। একই রক্ত বইছে এরও শরীরে। এরা শিকল কাটার দলে। পায়ে শিকল রাখে না এরা। কোনো শিকলই।

সান্যাল সাহেব রেগে প্রায় চিৎকার করে বললেন, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

বেড়াতে গেছিলাম বাবা।

—বেড়াতে? এত সময়? তোর চেহারা এরকম হয়েছে কেন? মহুয়া হাসল। এক দারুণ বিশ্বজয়ী হাসি!

তারপর বলল, 'সে অনেক গল্প বাবা, দারুণ ইন্টারেস্টিং। পরে তোমাকে বলব। কিন্তু আই এ্যাম সরি যে, তোমাকে এতক্ষণ ভাবিয়েছি। রাগ কোরো না প্লিজ। সোনা বাবা।'

এতক্ষণ কুমার চুপ করেছিল। হুইস্কী সিপ্ করতে করতে মহুয়ার দিকে তাকাচ্ছিল।

হঠাৎ কুমার বলে উঠল, 'সময়টা ভালই কাটল। কি বলো তাই না?'

মহুয়া সোজা সাঁপিনীর মত ফণা তুলে তাকাল কুমারের দিকে —তারপর হাসল—আবার সেই হাসি। তারপর চোখে আগুন ঝরিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, দ্যাটস্ নান্ অফ ইওর বিজনেস।

কুমার এক ঢোকে গ্লাসটা শেষ করে বলল, 'সার্টেনলি। আই নো দ্যাট। ইট ইজন্ট্ থ্যাঙ্ক ইউ।'

কুমারের কথা শেষ হতে না হতেই দরজা ঠেলে দাঁড়াল এসে সুখন।

সুখন অন্য কাউকে কিছু বলতে না দিয়েই বলল, টাকাটা দিলে ভাল হয়। তিনশো টাকা।

কুমার ওকে দেখে যেন ক্ষেপে গেল; তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে মিস্ত্রী? বিকেল চারটেয় স্ট্রাইক মিটে গেল—এতক্ষণে আমরা গাড়ি সারিয়ে চলে যেতে পারতাম বেত্‌লা—কিন্তু তুমি ছিলে কোথায়? তুমি কি মনে করো যে, তোমার এই ফাইভস্টার হোটেলে আমরা চিরজীবন থেকে যাব আর তুমি আমাদের যেমন খুশি তেমন ট্রিট করবে? তুমি

ভে-ভে-ভে-ভে-বেছ কি !

কুমারের মুখ দিয়ে একটু থুথু ছিটল। কুমার অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ায় তোতলাচ্ছিল।

সুখন ওর দিকে চেয়ে শান্ত গলায় বলল, যতখানি উত্তেজনা আপনার সয়, শুধু ততখানিই উত্তেজিত হওয়া উচিত। বেশি নয়। সেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কার্ডিয়াক এ্যাটাক হতে পারে।'

হোয়াট ? হোয়াট ?' বলেই, কুমার সিঁড়ি দিয়ে নেমে সুখনের দিকে তেড়ে গেল। বলল, 'স্কাউনড্রেল—সব জিনিসের সীমা থাকা দরকার। ইউ হ্যাভ সারপ্যাসড্ অল লিমিটস্। বলেই, কেউই যা ভাবতে পারিনি, যা কারো পক্ষেই, এমন কি কুমারের নিজের পক্ষেও ভাবা সম্ভব ছিল না, হয়তো একমাত্র অন্তর্যামী হুইস্কীই যা জানত, তাই করে বসল কুমার।

ঠাস্ করে এক চড় মেরে বসল সুখনকে।

গুলি-খাওয়া বাঘের মত প্রথমে রুখে দাঁড়াল সুখন। সান্যাল সাহেবের মনে হল আজ কুমারের কুমারত্ব আখরী দিন। আর কিছুই করার নেই।

কিন্তু পরমুহূর্তেই গায়ে জল-পড়া মেনী বিড়ালের মত, নিজের থেকেই সম্পূর্ণ অজানা কারণে সুখন নিজেকে নেতিয়ে, গুটিয়ে নিল।

যেন বললও আদুরে গলায়, মিঁয়াও।

কুমার ওর সামনে তখনও দাঁড়িয়েছিল ছাতের কার্নিসে ঘাড়ের লোম-ফোলানো লেজ-ওঠানো হুলো বেড়ালের মত এক অদ্ভুত হাস্যকর ভঙ্গীতে।

হঠাৎ মহুয়া সুখনকে উদ্দেশ্য করে বলল,'আপনি কি মানুষ ? আপনার গায়ে কি রক্ত নেই ? যে যা বলবে, বা করবে তা আপনি মুখ বুজে সহ্য করবেন ? চুপ করে মার খেতে পারেন—আপনি মারতে পারেন না। বলেই মহুয়া কেঁদে ফেলল।

সুখন একবার মহুয়ার দিকে আর একবার কুমারের দিকে শান্ত-ভাবে তাকিয়ে আশ্চর্য এক হাসি হাসল। তারপর বলল, 'আমি কাপুরুষ। আমি বীরপুরুষ নই।' বলেই বেরিয়ে গেল।

বেরিয়ে যেতে যেতে উঠোনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সান্যাল সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলল, টাকাটা মংলুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

কুমার যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ।

এক সময় স্বগতোক্তির মত কুমার বলল, কিন্তু মহুয়াকে শুনিয়ে—'লম্বা চওড়া পাঠানের চেহারা থাকলেই বীরপুরুষ হয় হয় না! পুরুষত্ব অন্য ব্যাপার। ফুঃ।' বলেই হুইস্কীর বোতল থেকে অনেকখানি হুইস্কী ঢালল গলায়।

॥ সাত ॥

টাকাটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েছিল কুমার মংলুকে দিয়ে।

মংলু চলে যাবার পরই সান্যাল সাহেব কুমারকে বললেন, তোমার কি এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরার ইচ্ছে নেই?

কুমার বলল, 'পৃথিবীতে আমার প্রাণের এনট্রান্সও যেমন আমার ইচ্ছাধীন ছিল না, এক্‌জিট্‌ও নয়। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন? কুমার শুধোল।

কুমার ও সান্যাল সাহেব দুজনেই বেশি হুইস্কী খাওয়ার দরুন "হাই" হয়েছিলেন। কুমার কম। সান্যাল সাহেব বেশি।

সান্যাল সাহেব বললেন, রঙের মিস্ত্রীর কাছে শুনলাম যে, সকালে তুমি সুখনবাবুকে গালাগালি করার জন্যই মিস্ত্রীরা বলেছিল মারবে তোমাকে। সুখনই নাকি তাদের থামিয়েছিল। আর এখন তুমি সুখনকে থাপ্পড় মেরেছ জানলে তো আমাদের ঘরশুদ্ধু আগুন দিয়ে মারবে।'

কুমার বলল, করে তা আর কি করা যাবে? আপনার অত ভয় লাগলে নিজের ইজ্জৎ রুমালে-মোড়া সিকনীর মত পকেটে ভরে আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যান কোথাও। আমি একাই থাকব।'

সান্যাল সাহেব বললেন, 'আহা। সে কথা নয়; সে কথা নয়।'

এরপর বেশি কিছু কথা-টথা হল না। কথা বলার মত অবস্থা বা মনের ভাব মহুয়া, তার বাবা বা কুমার কারোরই ছিল না।

রাতেও মুরগীর মাংস আর পরোটা বানিয়েছিল মংলু। সান্যাল সাহেব ও কুমার খেলেন। মহুয়া কিছুই খেল না। খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা শুয়ে পড়লেন।

সান্যাল সাহেব বললেন, আমার বড় গরম লাগবে ঘরে—আমি বারান্দাতেই শুচ্ছি।

দরজার পাশে, বারান্দায় তাঁর চৌপাই বের করে দিল মংলু।

উনি কুমারকে বললেন, 'দরজাটা ভেজিয়ে শুয়ো; আর মহুয়াকে দেখো। আমি তো দরজার সামনেই রইলাম। ভয় নেই। তোমাকে কেউ মারতে এলে আমাকে মেরে তারপর তোমাকে পাবে।'

মংলু যখন কারখানায় গেল টাকাটা নিয়ে, তখন সুখন কারখানাতেই ছিল। মংলু মুখ নীচু করে টাকাটা দিল সুখনের হাতে। মংলুর চোখ জ্বলছিল। বলল, 'ওস্তাদ, তুমি ছেড়ে দিলে কেন ঐ লোকটাকে।'

সুখন হাসল। বলল, 'দূর, ইঁদুর মেরে কি হবে! তুই কিন্তু ওদের যত্ন-টত্ন করিস ভাল করে। টাকা ফুরিয়ে গেলে টাকা চেয়ে নিস আমার কাছ থেকে। আশা করি কাল দুপুর নাগাদ গাড়ি ঠিক হয়ে যাবে। দুপুরেই ওরা চলে যেতে পারবে যেখানে যাবার।'

মংলু বলল, আপদ বিদেয় হবে।

সুখন আবার শুধোল, ওরা সকলে খেয়েছে রে?

—হ্যাঁ, কিন্তু দিদিমণি খাননি।

তাই বুঝি? স্বাভাবিক গলায় বলল সুখন।

মংলু শুধোল, আপনি ঘরে যাবেন না?

না।—সুখন বলল।

মংলুর মনে হল ওস্তাদ 'না'-টাকে ওর দিকে ছুঁড়ে দিল যেন।

মংলু আবার শুধোল, খাবার নিয়ে আসব এখানে?

—দুর্। আবার কি খাব? দুপুরে এত খেলাম। তুই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়। আমার ঘর থেকে একটা বালিশ আর চাদর দিয়ে যাস। আজ কারখানাতেই শোবো।

কিছুক্ষণ পর বালিশ আর চাদর বগলে কারখানায় ফিরে এসে মংলু দেখল যে, কারখানার শেডের নীচে, অনেকগুলো নামানো

ইঞ্জিন ও গীয়ার-বক্সের মধ্যে প্যাকিং-বাক্সের উপরে, পাঁচ লিটারের মবিলের টিন রেখে একটা টেবিল-মত বানিয়ে নিয়েছে ওস্তাদ। তারপর চোপাইয়ে বসে, সামনে লণ্ঠন রেখে, কাগজ কলম বাগিয়ে বসেছে।

মংলু যেতেই সুখন বলল, 'একটু পান আর সিগারেট এনে দিবি মংলু? মিসিরজীর দোকান কি খোলা আছে?'

খোলা না থাকলে খুলিয়ে আনব। উৎসাহের গলায় বলল মংলু।

ওস্তাদকে বড় ভালো লাগে মংলুর। আর ভালো লেগেছিল দিদিমণিকে। দিদিমণি যদি এখানে থেকে যেতে পারত, বড় মজা হতো। আজ সকলে দিদিমণি ওর সঙ্গে লুডো খেলেছিল। কি মিষ্টি করে কথা বলে দিদিমণি। কি সুন্দর করে তাকায়। ভদ্র-লোকদের সব মেয়েরাই কি এত ভদ্র, এত ভালো?

মংলু রাস্তায় মিসিরজীর দোকানে পান আনতে গেছিল। দোকান তখনও খোলা ছিল। একদিকের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেলেও, হ্যাজাক জ্বলছিল দোকানে, হ্যাজাকের আলোর ফালি এসে পথে পড়েছিল। দোকানঘরের পাশে কতগুলো সেগুন গাছ। হাওয়ায় সেগুনের বড় পাতা থেকে সড় সড় আওয়াজ উঠছিল। হাতির কাতের মত দেখতে পাতাগুলো খসে যাচ্ছিল হাওয়াতে।

মহুয়া জানালায় দাঁড়িয়েছিল। ঘরে কোনো আলো ছিল না। ফিতে কমিয়ে রাখা হ্যারিকেনটা বারান্দায় বাবার চৌপায়ার পাশে রাখা ছিল। দরজাটা আধভেজানো। দরজার দিকে কুমারের চৌপায়া। মহুয়ারটা ভেতরে।

বাবার উপর খুব রাগ হচ্ছিল মহুয়ার। এত বেশী হুইস্কী খাওয়ার কোনো মানে নেই। কুমারের সঙ্গে তাকে এক ঘরে দিয়ে নিজে বারান্দায় শোওয়ারও মানে নেই। বাবার মনের ইচ্ছেটা মহুয়া বুঝতে পারে, কিন্তু কি করবে; কুমারকে কলকাতায় যাও-বা ভালো লাগত বাইরে এসে এ দুদিনেই একেবারে বিরক্ত হয়ে উঠেছে ও। কুমারকে বিয়ে করবার কথা ভাবতেও পারে না আজ মহুয়া। এ্যাপার্ট ফ্রক বিয়ে, ওর সঙ্গে অন্য কোনো সম্পর্কের কথাও ভাবতে পারে না।

জানালায় দাঁড়িয়ে ফুটফুটে কাক-জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া

পথ, প্রান্তর, কজওয়ের নীচের ঝিরঝির করে জল-বয়ে যাওয়া নালাটা দূরের পাহাড় সব দেখছিল মহুয়া।

ও ভাবছিল যে, সুখ শাকুয়া-টুঙ থেকে ফেরার সময় বলেছিল, আরো ক'দিন পরে এলে দেখতে পেতেন পাহাড়ে পাহাড়ে কেমন আগুনের মালা জ্বলে—মালা বদল হয়। পাহাড়দের বিয়ে হয়। কী আশ্চর্য অনাবিল স্বল্প চাহিদার সরল জীবন সুখের। চাহিদা নেই কিছু ওর, অথচ দেওয়ার ক্ষমতা কী অসীম। এ পর্যন্ত মহুয়া একাধিক পুরুষের সান্নিধ্যে এসেছে—কিন্তু কখনও এত ভালো লাগেনি ওর আগে। অবশ্য ওর সর্বস্ব দেয়ওনি আগে ও কাউকে এমন করে। সমস্ত শরীর কারো পরশ মাত্রই এমন মাধবীলতার মত মুহূর্তের মধ্যে ফুলে ফুলে ভরে যায় নি। এই রুক্ষ অথচ ভীষণ নরম লোকটা কি যেন যাদু জানে।

মংলুকে দেখতে পেল মহুয়া। মংলু আলোর সামনে দাঁড়িয়ে পানওয়ালার সঙ্গে কথা বলছে। হাসছে, কি যেন বলছে আলাপ-বিদ্ধ মুখে! বেশ ছেলেটা!

মহুয়া ভাবছিল, সুখন খেল কি না কে জানে? এখন আর শুধোনো যাবে না। বাবা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। কুমার ঘুমিয়েছে কি না তাও মহুয়া জানে না। কুমার ঘুমিয়ে পড়ার আগেই মহুয়া ঘুমিয়ে পড়তে চায়—নইলে এত কাছে কুম্ভকর্ণর নাক-ডাকার আওয়াজে ঘুম আসবে না কিছুতেই।

কিন্তু আজ কি মহুয়ার ঘুম আদৌ আসবে? ঘুম কি আসবে কিছুতেই? নাই-ই বা ঘুমোল এক রাত। এমন রাত। এমন সুখ-স্মৃতির; আবেশের রাত। কাল কি করবে ভাবতে হবে মহুয়াকে! ও কি সত্যিই থাকবে সুখের কাছে? যদি নাই-ই পারবে, তাহলে এত বড় বড় কথা বলল কেন ও মুখে? সুখ কি আগেই জানত যে, ও থাকতে পারবে না, থাকতে চায় না তাই-ই কি অমন করে হাসছিল তখন? যদি কিছু সত্যিই হয়, হয়ে যায় তবে কি সুখের কাছে ফিরে আসবে মহুয়া—কোনো ভিক্ষা নিয়ে? সে যদি আসেই, সুখ কি তাকে চিনতে পারবে তখন?

জানে না, মহুয়া কিছুই জানে না। এই বন-জঙ্গল বড় খারাপ। ফিস্‌ফিস্ ফিস্‌ফিস্ করে কারা যেন কথা বলে, আড়ালে-

আড়ালে ; হাসে কারা যেন গান গায়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অভিশাপ দেয়। বিড়বিড় করে ডাইনীর মত—তাদের দেখা যায় না।

সুখকে প্রথম দেখাতেই সে সব দিতে রাজী ছিল, তবুও তার সংস্কার, তার শিক্ষা, তার সহজাত লজ্জা সব কিছু অত সহজে হারাত না ও, যদি না ভুল করে শাকুয়া টুঙ-এ যেত। প্রকৃতির বুকের মধ্যে গিয়ে পড়তেই, এত বছরের শিক্ষা, শিক্ষার দম্ভ, রুচির অহংকার, লজ্জার আড়াল যেন এক মুহূর্তে কাঁচের ঘরের মত ভেঙে পড়েছিল। প্রকৃতির মধ্যে এলে কোনে আড়ালই বুঝি থাকে না ; রাখা যায় না। এখানে না এলে, এ কথা জানতে পেত না মহুয়া।

এখনও পুরো ব্যাপারটা ভাবলে একটা স্বপ্ন বলে মনে হয়। দুঃস্বপ্ন নয়, একটা দারুণ সুন্দর স্বপ্ন ; সে-স্বপ্ন বুঝি এ-জন্মে আর কখনও মহুয়া দেখতে পাবে না। কিংবা পাবে হয়ত, কে জানে, যদি কখনও আবার অমন পাথরের উপর, নদীর সাদা বালিতে এমন চাঁদের আলোয় সুখের বুকে আশ্লেষে ঘুমিয়ে থাকার সুযোগ আসে।

বাইরের বাতাসে মহুয়ার গন্ধ ভাসে। মহুয়ার ভীষণ গর্ব হয়। ওর নামের জন্য। কে যেন তাকে প্রথম এ-নামে ডেকেছিল? যখন ডেকেছিল সে তো একটা ডাক মাত্র ছিল। আজ এই চাঁদের রাতে, দোলপূর্ণিমার কাছাকাছি, হাওয়ায়-ওড়া এত সুগন্ধের মধ্যে ও ওর নামের মাহাত্ম্য খুঁজে পেল। নাম, সে যে-কোনো নামই হোক না কেন, সে তো শুধু ডাক নাম নয়। সে-যে নিছক ডাকের চেয়ে অনেক বড় ; হৃদয়ের অন্তস্তলে, মস্তিষ্কের কোষে-কোষে সে ডাক হাজার হাজার কুঁড়ি ফোঁটায়, কুঁড়ি ঝরায়। মহুয়া ভাববার চেষ্টা করছিল। কে-কে প্রথম তাকে ডেকেছিল মহুয়া বলে ?

মংলু পান আর সিগারেট দিয়ে চলে গেল।

সুখন টেবিল ঠিক করে কারখানা থেকে বেরিয়ে কুয়োতলায় গিয়ে চান করল। তোয়ালে-টোয়ালে নেই। ভিজে গায়েই আবার ছাড়া জামা-কাপড় পরল। আঙুলগুলোকে চিরুনী করে মাথা আঁচড়াল, তারপর কারখানায় এসে তার চৌপাইয়ে বসল।

ছোটবেলা থেকে সুখন লেখক হবার স্বপ্ন দেখেছিল। হয়েছে মোটর মিস্ত্রী। লেখার মধ্যে কলেজ ম্যাগাজিনে একটি গল্প লিখেছিল। একটি মাত্রই লেখা তার ছাপা হয়েছিল। সুখন পড়েছে, শুনেছে যে, অনেক বিখ্যাত লেখকের হাতে-খড়ি হয়েছে প্রেমপত্র লিখে। সে জীবনে প্রেমপত্র লেখেনি কাউকে। কলেজের একটি মেয়ে, যে তাকে চোখের ভালো-লাগা জানিয়েছিল, তার উদ্দেশে কবিতা লিখেছিল একটি, কিন্তু পেঁছয়নি তার কাছে। এক বন্ধু চানাচুর কিনে সেই কবিতা মুড়িয়ে বাড়ি নিয়ে গেছিল।

আর লিখেছে ডাইরি। অনেক। কিন্তু তার ডাইরি সে নিজে ছাড়া আর কেউ পড়েনি।

আজ সে জীবনে এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে প্রথম প্রেমপত্র লিখতে বসেছে। এ এক আশ্চর্য প্রেমপত্র।

প্রেমপত্রের উদ্দেশ্য সাধারণত প্রেমের পাত্রর কাছ থেকে প্রেম পাওয়া বা ঈস্পিত প্রেমিক প্রেমিকাকে পাওয়া। ওর জীবনের প্রথম প্রেমপত্র সে এমন একজনকে লিখছে যে, সে কিছু চাইবার আগেই যে তাকে সবই দিয়ে দিয়েছে কিছুই বাকি না রেখে। একজন মেয়ে কাউকে ভালোবেসে যা কিছু দিতে পারে তার প্রেমিককে সেই সব-ই। তার এই প্রেমপত্রের উদ্দেশ্য, কিছু পাওয়া নয়, বরং যা পেয়েছে সেই প্রাপ্তিকে স্বীকার করা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

এই প্রথম এবং হয়তো বা শেষ চিঠি মহুয়াকে লিখতে বসার জন্যে সে মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। একটা দারুণ ভালোলাগা, এক সার্থকতার উষ্ণবোধ তাকে অত্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। জীবনে কারো ভালোবাসা পায়নি সে এতদিন ; কিন্তু আজ ওর মনে হচ্ছে যে কাউকে ভালোবাসা ও কারো কাছ থেকে ভালোবাসা পাওয়া ব্যতিরেকে কোনো পুরুষের পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কুমারকে আজ ক্ষমা করে দিয়ে সে নিজেই নিজের কাছে প্রমাণ করেছে যে, ভালোবাসা মানুষকে বড় বদলে দেয়। হয়তো নিজের সত্যিকারের নিজত্বের চেয়ে কাউকে অনেক অনেক বড় করে ; হয়তো বা ছোটও করে কাউকে। কিন্তু যে কোনো মানুষের জীবনেই ভালোবাসার অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব যে তাকে

প্রচণ্ডভাবে পরিবর্তন করে—একথা সুখন এই কয়েক ঘণ্টাতেই নিশ্চিতভাবে বুঝেছে। ভালোবাসার জনের সুখে আনন্দে, যে ভালোবাসে তার যে কত গভীর সুখ, সেই জনের জন্য একটু কিছু করতে পারার মধ্যে যে কত ভালোলাগা, তা সুখন জেনেছে।

রাস্তায় বীরুজু শাহর গদীর কুকুরগুলো এক সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। শেয়াল-টেয়াল দেখে থাকবে কিংবা কোনো শুয়োরের দল। টাঁড় পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে বোধহয়।

চাঁদের আলোয় মশারির মত রাত ঝুলে আছে বাইরে।

একটা পিউ-কাঁহা ডাকছে গুঞ্জার দিকের টাঁড়ে। চারদিকে এই চাঁদের রাতে এক চকচকে অথচ স্থির স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতা। করৌঞ্জ, শালফুল ও মহুয়ার গন্ধ ভাসছে সমস্ত আবহাওয়ায়। আঃ মহুয়া! তুমি বড় সুন্দর। তোমার মহুল ফুলের মত ছিপছিপে শরীর, তোমার লাজুক-লতানো ব্যক্তিত্ব—তোমার সব, সব, সব। তোমার চোখ, চিবুক তোমার ঠোঁটের তিল।

"মহুয়া", "মহুয়া" বলে কে যেন ডাকল মহুয়াকে।

মহুয়া ঘুমিয়ে পড়েছিল যে তা নয়। কিন্তু কেমন একটা মদির আবেশে নিমগ্ন ছিল। চোখ খুলে, অন্ধকারেই মহুয়া দেখল, কুমার কখন তার চৌপাইয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাইরে বাবার গভীর ঘুমের নিঃশ্বাসের একটানা ওঠানামার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মহুয়া কিছু বলার আগেই কুমার তার ঠোঁটে হাত রাখল। তারপর এক হাত ওর মুখে চেপে, অন্য হাতে তার বাহু ধরে তাকে তুলে নিজের চৌপাইয়ে উঠিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল।

মহুয়ার মনে হয়েছিল, ওকে নিশিতে ডেকেছে। স্লিপ-ওয়াকিং করে পথটুকু চলে গেলে ওর আর কিছুই বাকী থাকবে না। মহুয়া আর মহুয়া থাকবে না।

তখনও সুখের সঙ্গে কাটানো সন্ধ্যের, সেই শিরশিরানি সুখ তার শরীরে মনে মাখামাখি হয়েছিল—খুশ্‌বু আতরের মদিরতার মত। ও তখনও নিজের বশে ছিল না। কুমার যা-কিছু করতে চাইল তার কোনো কিছুতেই মহুয়ার বিন্দুমাত্র সায় ছিল না।

কিন্তু প্রথমে ও বাধা দিল না। ওর মনে হল কুমার যেন জন্মাবধি বুভুক্ষু কোনো মন্বন্তরের কাঙালী।

সুখের সঙ্গে একটুও মেলে না।

এককালীন ক্ষুধা, রুচিহীনতা, আদেখলাপনা ও অস্থির আনুরোম্যাণ্টিক তার সঙ্গে কুমারকে কুৎসিতভাবে কুটুরে ব্যাঙের মত জড়িয়ে ধরল।

কুমারের এই জান্তব ব্যবহার মহুয়ার ভালো অথবা মন্দ কিছু লাগল না। ওর উদাসীনতায় ও ভরে রইল। ওর মনে হল সুখনের কোলেই যেন বনজ-গন্ধে ভরা পাহাড়ী নদীর খোলে ও শুয়ে রয়েছে এখনও, আর একটা শেয়াল তার শরীর শুঁকছে, কামড়ে খাচ্ছে। ও-যে ওর সুখের কাছেই আছে, এই সুখময় বোধটুকু ছাড়া মহুয়ার আর কোনো বোধই ছিল না সেমুহূর্তে।

মহুয়া সেই মদির ঘোরের মধ্যে যেন পাশ ফিরে শুলো। তারপর হঠাৎ দু'হাত জোড়া করে আসুরিক শক্তিতে রোগা-পাতলা ও নেশাগ্রস্ত কুমারকে বুকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল।

কুমার পড়ে গেল চৌপায়ার উপরে। চৌপাইটা নড়ে উঠল— হঠাৎ খুব জোর আওয়াজ হল তাতে।

বাইরে থেকে সান্যাল সাহেব ঘুম-ভেঙে চেঁচিয়ে উঠলেন— প্লিজ, মেরো না, ওকে মেরো না, মাপ চাইছি বাবা আমরা, আমরা মাপ চাইছি।

মহুয়া দৌড়ে এল বাইরে। বলল, 'বাবা, জল খাবে?

সান্যাল সাহেব উঠে বসেছিলেন; সারা শরীর ভয়ে ঘেমে গেছিল ওঁর। মহুয়াকে দেখ উনি শুধোলেন, কুমারকে কি খুব মেরেছে ওরা? মেরে ফেলেছে?'

মহুয়া ঘর থেকে জল এনে দিয়ে সান্যাল সাহেবের কপালে হাত দিয়ে বলল, 'কুমার তো ঘুমোচ্ছে বাবা! তুমি স্বপ্ন দেখছিলে!'

তবে শব্দ? শব্দ কিসের হলঘরে। সান্যাল সাহেব ঘুম জড়ানো গলায় বললেন।

কুমার ঘর থেকে বাইরে এসে বলল, 'বেড়াল।'

মহুয়া কথা কেড়ে বলল, 'একটা উপোসী হুলো বেড়াল ঘরে ঢুকেছিল।'

॥ আট ॥

আধ-ফোটা ভোরের প্রথম বাসেই সুখন নিজেই রাঁচী যাবে। এমন জিনিসই ভাঙল গাড়িটার যা এ-তল্লাটে পাওয়া অসম্ভব। চিঠিটা শেষ করল সুখন।

হাতঘড়িতে দেখল তিনটে বাজে। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই আলোর আভাস জাগবে পুবে। মদনলাল কোম্পানীর বাস ঠিক চারটে বেজে দশ-এ এসে দাঁড়াবে মিসিরজীর দোকানের সামনে। তখন শেষ রাত। ঝিরঝির করে আসন্ন ভোরের গন্ধ-মাখা একটা হাওয়া ছেড়েছিল।

সুখন একটা বড় হাই তুলল। আড়মোড়া ভাঙল। পায়ের কাছে শুয়ে থাকা কালুয়া নড়েচড়ে বসল, ডান পা দিয়ে খচর্ খচর্ করে ঘাড় চুলকোলো, তারপর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে সামনে দু'পায়ের উপর মুখটা রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

একটা সিগারেট ধরাল সুখন। সারা রাত পান খেয়ে জিভটা ছুলে গেছে। জর্দাও বেশি খাচ্ছে আজকাল। মাঝে মাঝে বাঁ দিকের বুকের ব্যথা করে। কেয়ার করে না ও। নিজেকে নিয়ে, নিজের শরীরকে নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি ও। আবার একটা পান মুখে দিল। তারপর চিঠির পাতাগুলো এক সঙ্গে করে চিঠিটাকে পড়বে বলে, চৌপাইতে এসে শুয়ে পড়ল। সারারাত সোজা বসে থেকে কোমরটা ভীষণ ব্যথা করছিল। ঘুম না এসে যায়। মনে মনে নিজেকে বলল সুখন সুখন।

২৫ শে মার্চ
ফুলটুলিয়া, গুঙ্গা
পালামৌ

তোমাকে মহুয়া বলেই ডাকতে পারতাম। কিন্তু তুমি চলে গেলে যে ডাকে কেউই সাড়া দেবে না, সে ডাকে ডেকে লাভ কি?

তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দেবো, জানি না আমি। ধন্যবাদ ব্যাপারটাই পোষাকী সৌজন্যর এবং তোমার বয়-ফ্রেণ্ডের গাড়ির মতই, "ইম্পোর্টেড"। কোনোরকম পোষাক এবং পোষাকী ব্যাপারকেই যখন আমার দুজনেই প্রশ্রয় দিইনি, তখন পোষাকী সৌজন্য আমাদের মানায় না।

এখন রাত গভীর। পায়ের কাছে কালুয়া শুয়ে আছে। কালুয়ার মন খুবই খারাপ। কালুয়া তোমাকে ভাল মনে নেয়নি। ও ওর স্বাভাবিক সারমেয়-স্বভাবে ভেবেছিল, চিরদিন ও একাই আমাব মালকিন থাকবে! কেউ একদিনের জন্য এসে যে আমার উপর এমন জবরদখল নেবে তা ওর ভাবনার বাইরে ছিল।

আমার ধাবণা, তুমি কালুয়ার মুখেব দিকে ভাল করে একবারও তাকাওনি। কালুয়া বড় সুন্দরী। সাধারণত সব কুকুরের মুখশ্রীই অত্যন্ত সুন্দর। পথের কুকুরের মুখেও যে বুদ্ধিমত্তা এবং চোখে যে ব্যক্তিত্বময় ঔজ্জ্বল্য দেখা যায় তা অনেক মানুষের মুখেও দেখিনি। অনুরোধ যাওয়ার আগে আমার কালুয়ার মুখে একবার ভাল করে চেয়ো এবং ওকে একবার আদর করে যেও।

তোমার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না। তবু, আমি হারিয়ে যেতে চাই না। পালাতে তো নয়ই। তাছাড়া, আমার পালাবার মত কোনো জায়গাও নেই। সুখন মিস্ত্রী এই ফুলটুলিয়া বস্তিতেই থাকবে আমৃত্যু। তোমাদের মত গতিবেগসম্পন্ন মানুষদের গতি যাতে অব্যাহত থাকে, তা দেখাই আমার কাজ। অথচ আমরা নিজেরা গতিমান নই; অনড়, স্থাবর।

যা ঘটে গেছে, তার জন্য আনন্দরও যেমন সীমা নেই আমার, দুঃখেরও নয়। তোমার মত একজন উচ্চবংশের, শিক্ষিতা অভিজাত মেয়েকে আমি কোনোরকম বিপদেই ফেলতে চাইনি! আশাকরি যা ঘটে গেছে তার দায়িত্ব তুমি আমার সঙ্গে সমানে ভাগ করে নেবে।

মনে কোনো পাপবোধ রেখো না এ বাবদে। যে মিলনে আনন্দ নেই, সে মিলন অভিপ্রেত নয়। আনন্দই যেন থাকে, আর আনন্দের স্মৃতি। এ নিয়ে আমার অথবা তোমার মনে কখনও যেন কোনো অনুশোচনা না হয়। তা হলে এই পরম প্রাপ্তির সব মিষ্টত্ব তেতো

হয়ে যাবে চিরদিনের মত।

তবে স্বীকার করো আর নাই-ই করো, তুমি বড়ই ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষ বলেই তুমি এখনও অপাপবিদ্ধ, মহৎ। পৃথিবীর নীচতা, দৈনন্দিন জীবন-জাত ব্যবসায়ীসুলভ সাবধানতা এখনও তোমার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেনি। সে কারণেই তোমার পক্ষে অত সহজে সহজ হওয়া সম্ভব হয়েছিল। প্রার্থনা করি, তোমার এই সহজ-সত্তাকে চিরদিন এমনিই রাখতে পারো তুমি।

তুমি আমার জীবটাকে, এই নিরুপায় মেনে-নেওয়া মিস্ত্রীগিরির জীবনটাকে, বড় নাড়া দিয়ে গেলে। আমার গর্ব ছিল যে, নিজেকে বইয়ের মধ্যে, কাজের মধ্যে, ডাইরি লেখার মধ্যে এবং আমার উৎসারিত আনন্দের উৎস এই প্রকৃতির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে দিয়ে আমি বুঝি একজন স্বয়ং-সম্পূর্ণ মানুষ করতে পেরেছিলাম নিজেকে। সে নিজেকে নিয়ে, নিজের কাজ এবং অকাজ নিয়েই এ যাবৎ ষোলো আনা খুশি ছিল, খুশি ছিল শাকুয়া টুঙ-এর একাকী এবং একক অস্তিত্বে, বাইরের কোনো কিছুতেই তার প্রয়োজন ছিল না বলেই সে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল।

জানো মহুয়া, শাকুয়া-টুঙের নির্জন নির্মোক প্রদোষে অথবা ঊষায় আমার প্রায়ই মনে হতো, আমি বোধহয় স্বয়ম্ভু। শুধু তাই-ই নয়, আমি সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কিন্তু তুমি, আমার এই মিথ্যে গর্বকে ভেঙে টুকরো করে দিয়ে গেলে। বুঝিয়ে গেলে যে, জীবনে ষোলো আনা প্রাপ্তিই সব নয়। ষোলো আনার উপরেও কিছু থাকে ; যা উপরি, পড়ে পাওয়া, অথচ যার উপর জীবনের সার্থকতা দারুণভাবে নির্ভরশীল। তোমার চোখের পূর্ণ শান্ত দৃষ্টিতে, তোমার নম্র শান্ত ব্যবহারে, তোমার স্বচ্ছতোয়া শরীরের সুগভীর স্নিগ্ধ উষ্ণতায় তুমি আমাকে চিরদিনের মত জানিয়ে দিয়ে গেলে যে পৃথিবীর কোনো পুরুষই স্বয়ম্ভর নয়। হতে পারে না।

যতদিন অভাব পূরিত হয়নি, ততদিন অভাবটাকেই একমাত্র অমোঘ এবং অনস্বীকার্য ভাব বলে মেনে নিয়েছিলাম। সেই

অবস্থাকেই স্বয়ং সম্পূর্ণতা বলে সাংঘাতিক এক ভুল করেছিলাম। তুমি আমাকে এক আশ্চর্য আকাশতলের আনন্দযজ্ঞে ডাক দিলে। আমার প্রাণের কেন্দ্রের সব শূন্য পূরণ করে জানিয়ে গেলে বরাবরের মত যে, পুরুষের শেষ এবং একমাত্র গন্তব্য, তার চরম চরিতার্থতা শুধু কোনো নারীতেই।

তোমরা যে আমাদের রুক্ষ, ধুলোমাখা জীবনের, আমাদের নির্বুদ্ধি সর্বজ্ঞতার, আমাদের দুর্দম পুরুষালী-বোধের উপর কিছুমাত্র নির্ভরশীল নও, তোমরা যে তোমার চোখ-চাওয়া, তোমাদের হাসি, তোমাদের ভালোবাসায় ঐরাবত-প্রবর স্থূল-গর্ব সর্বস্ব পুরুষদের ইচ্ছে মত ভাসিয়ে দিতে পারো অবহেলায়, একটা দারুণ জানা।

মহুয়া, তোমাকে দিতে পারি এমন আমার কিছুমাত্র নেই। সত্যিই নেই। তোমার হয়তো প্রয়োজন কিছুতেই নেই; তবু আমার দেওয়ার আগ্রহটা তোমার প্রয়োজনের তীব্রতার উপর ডিপেণ্ডেণ্ট নয়। তোমাকে কিছু একটা; কোনো কিছু দেবার বড় ইচ্ছে ছিল - যাতে আমাকে কিছুদিন অন্তত তোমার মনে থাকে। কিন্তু এই স্বল্প সময়ে কিছুতেই ভেবে পেলাম না পার্থিব কোনো দানের কথা। কতটুকু আমার ক্ষমতা! আমার কী-ই বা আছে তোমাকে দেওয়ার মত। তোমার যে সবই আছে, সমস্ত কিছু।

হাতে করে কিছু দিই আর নাই-ই দিই, তুমি জেনো যে, তোমাকে এমনই কিছু দিয়েছিলাম যা আর কাউকেই দিইনি, হয়তো কখনোই দিতে পারবও না।

তুমি রানীর মত চলে যাবে কাল, আমাকে ভিখিরী করে। যা-কিছু আমার ছিল, এতদিনের, এত বছরের যা-কিছু যত্ন করে রাখা--তার সবই তুমি নিয়ে যাবে তোমার সঙ্গে।

বিনিময়ে যা দিয়ে যাবে, তার সঙ্গে শুধু তুলনা চলে কোনো মহীরুহর বীজের। এই মুহূর্তে ভবিষ্যতের স্পষ্ট অনুমান ও কল্পনাও বুঝি সম্ভব নয়। আশা করি, তোমার এই দান একদিন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আমার মনের গভীরে এক সান্ত্বনা-দাত্রী ছায়ানিবিড় গাছের মত প্রতিষ্ঠিত হবে। তোমার স্মৃতি বুকে

নিয়ে বাকি জীবনটা সুখন মিস্ত্রীর দিব্যি পান জর্দা খেয়ে, গাড়ি মেরামত করে হেসে-খেলেই চলে যাবে।

আমার আজকে মনে হচ্ছে, বার বার মনে হচ্ছে যে জীবনে একজন মানুষ কত পায়, কতবার পায় ; তাতে কিছুই যায় আসে না ; কিন্তু সে কী পায় এবং কেমন করে পায় তাতে অনেক কিছুই যায় আসে।

যারা সাধারণ, তারা দস্তুরের দাগা বুলিয়েই বাঁচে। একজন আর্টিস্ট-এর সঙ্গে সাধারণ লোকের এখানেই তফাৎ। তুমি একজন উঁচুদরের আর্টিস্ট। তোমার জীবনটাকে নিয়ে ইচ্ছেমতো রঙ-তুলির আঁচড় বোলাতে এবং এমন কি ইচ্ছেমত জীবনের ইজেলটাকে ছিঁড়ে ফেলতেও বুঝি তোমার বাধে না। তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তবু তোমাকে আমি এক বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছি ; আমার মনে।

আমার মত অখ্যাত লোকের মস্ত সুবিধে এই-ই যে, তাদের লেখা কোনো পত্র-পত্রিকার ছাপা হবে না ; খ্যাতি যেমন তাব নেই, তেমন পাড়া-বেপাড়ার গণ্ডমূর্খদের তাকে সমালোচনা করার অধিকারও সে দেয়নি। বিখ্যাত লোকের বিচারক সকলেই, তাদের সে বিচারের যোগ্যতা থাক আর নাই-ই থাক। আমার বিচারের ভার রইল শুধু তোমারই হাতে। আমার মহুয়ার হাতে।

পরিশেষে, তোমাকে একটা কথা বলব। কথাটা হচ্ছে এই-ই যে, কুমারবাবু তোমারই শ্রেণীর লোক। তুমি এবং তোমার বয়সী অনেকেই হয়তো শ্রেণীবিভাগ মানে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই-ই যে, তোমার কি আমার মানা-না-মানার উপর আজও শ্রেণীবিভাগের কালাপাহাড় অস্তিত্বর কিছুমাত্র যায় আসে না। তার শিকড় বড় গভীরে প্রোথিত আছে। তাই বলছি যে, কুমারবাবুকে বাতিল করার আগে দু'বার ভেবো।

ভেবে অবাক লাগছে যে তোমার কারণেই কুমারবাবুর উপরে আমারও একটা দুর্বোধ্য দুর্বলতা জন্মে গেছে। নইলে সান্যাল সাহেবকে হয়তো তার লাশ নিয়ে ফিরতে হতো এখান থেকে। সুখন মিস্ত্রী গাড়ির কাজ ভালো না জানলেও খুন-খারাবীটা খারাপ জানে না। আমার যা কাজ, যাদের নিয়ে কাজ, তাতে আমার

নিজেরই অজান্তে আমি অনেক বদলে গেছি। কখনও সুযোগ এলে কুমারবাবুকে বোলো, তোমার খাতিরে সুখন মিস্ত্রী ছেড়ে দিলেও অন্য অনেকে ভবিষ্যতে নাও-ছাড়তে পারে। তাঁর নিজের মুখের টোপোগ্রাফি রক্ষার স্বার্থেই তাঁকে একটু ভদ্রতা শিক্ষা করতে বোলো।

চিঠিটা অনেক বড় হয়ে গেল। এক সঙ্গে এত কথা মনের মধ্যে ভীড় করে আসছে যে, গুছিয়ে লিখতে পারা গেল না। আমার সমস্ত অস্তিত্বটাই বড় অগোছালো করে দিয়ে গেলে তুমি।

ভালো থেকো মহুয়া, সব সময় ভালো থেকো। নিঃস্বার্থভাবে মঙ্গল কামনা করার অন্তত একজন লোকও তোমার রইল, বড় কম পাওয়া বলে ভেবো না।

যা করলাম, অথবা করলাম না, তা সবই তোমার ভালোর জন্যই ; এটুকু জেনো। তুমি যা বলেছিলে, যা করতে চেয়েছিলে, তা যে নিতান্তই ছেলেমানুষী, তা তুমি এখান থেকে চলে গেলেই বুঝতে পারবে। এই চলে যাওয়ায় আমার প্রতি যেটুকু মমত্ববোধ জাগবে তোমার, হয়তো থাকবেও ; সেটুকু আমার কাছাকাছি চিরদিন থাকলেও জাগত না। এটা সত্যি। বিশ্বাস করো।

যাকে কাছে রাখতে চায় কেউ, তাকে দূরে দূরে রাখাই বুঝি তাকে কাছে রাখার একমাত্র উপায়। বড় বেশি কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি বেশিদিন থাকলে ভালোলাগার, ভালোবাসার রঙটা ফিকে হয়ে যায়।

সব সময় আমাকে মনে পড়ার দরকার নেই। পড়বে যে না সেও জানি। মাসান্তে কি বৎসরান্তে কোনো একলা অবসরের মুহূর্তে হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে-আসা জঙ্গলের বনজ গন্ধের মত আমার কথা যদি মনে পড়ে তোমার, তাহলেই আমি ধন্য বলে জানব নিজেকে।

আমি জানি, তুমি চলে গেলে, বড়ই ফাঁকা লাগবে। আমি, কালুয়া মংলু আমাদের তিনজনের সংসার। পাগল-পাগল লাগবে—জানি আমি। কিন্তু কিছু করার নেই।

মহুয়া, আমার ঝড়ের ফুল ; ভালো থেকো, সব সময় ভালো থেকো।/

– ইতি সুখন মিস্ত্রী

চিঠিটা আরো একবার পড়ল সুখম। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে অনেকক্ষণ ভাবল।

অনেকক্ষণ ভেবে-টেবে, তারপর হঠাৎ কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল চিঠিটাকে। মনে মনে বলল, দুস্‌স্‌, কি লাভ? লাভ কি?

চিঠিটা ছিঁড়ে মুঠো পাকিয়ে কাগজের কুচিগুলো কারখানার আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিল। তারপর একেবারে নিশ্চল রইল বহুক্ষণ।

সুখন খুব বিষণ্ণতার সঙ্গে ভাবল, ছিঁড়বেই যদি তাহলে এত কষ্ট করে রাত জেগে এ চিঠি লিখল কেন? কি ভাল হল?

বিড় বিড় করে বলল, সব ফেলা গেল। তারপরই ভাবল, সত্যিই কি ফেলা গেল? জানে না সুখন এতসব। এমন করে কখনও ভাবেনি আগে। কখনও যে ভাবতে হবে, তাও ভাবেনি।

সুখন বলল আবার নিজেকে যানে দেও মিস্ত্রী। তুমি যেখানে থাকার, এই পোড়া-মবিলের, ওয়েল্ডিং করার গ্যাসের গন্ধে, নানারকম যান্ত্রিক ও ধাতব শব্দের মধ্যে যেমন আছ, তেমনই থাকো। হঠাৎ হাওয়ার ঝলকানিতে যেটুকু বাস পাও মহুয়ার সেটুকুই ঢের—এর বেশি আশা কোরো না, ভুলেও চেয়ো না। ভুলে যেয়ো না যে তুমি শালা দুখন মিস্ত্রীর ভাই সুখন। যা পেয়েছ তার স্মৃতিটুকুই বুকে করে রেখো, রোমন্থন কোরো —গায়ের লোম-পড়া দহের পাঁকে গা-ডুবানো বুড়ো মোষ যেমন করে জাবর কাটে, তেমনি করে—এর বেশি কিছু এই পোড়া জীবন থেকে তোমার পাবার নেই।

॥ নয় ॥

মনের মধ্যের সুখজনিত লুকোনো অথচ তীব্র আনন্দটা মহুয়াকে আধো-ঘুমে আধো-জাগরণে কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল, হাওয়ায় ভেসে যাওয়া সেগুন পাতাদের সঙ্গে।

কিন্তু মধ্য রাতে সেই আনন্দ যখন বিঘ্নিত হয়েছিল, হঠাৎ তলা-ফেঁসে যাওয়া নৌকার মত মনে মনে ও তালিয়ে গেল। পরক্ষণেই ফেঁসে-যাওয়াটা মিথ্যে এবং ভেসে-যাওয়াটাই সত্যি একথা

জানতে পেরে ও আবার আনন্দিত হয়েছিল।

কিন্তু ঘুম ভাঙতেই দেখল বেলা অনেক, শরীর মন সব ক্লান্তিতে এবং আলস্যে ভরা।

হঠাৎ চোখ মেলে, শূন্য মস্তিষ্কে উপরে মাকড়সার জালঝোলা টালির ছাদে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ বুঝতে পারল না যে, ও কোথায় তারপর ধীরে ধীরে সব মনে পড়ল; স-ব কিছু। মস্তিষ্কের শূন্যতা আস্তে আস্তে পাখির ডাকে রান্নাঘরের শব্দে লাটাখাম্বার জল ওঠার ক্যাঁচোর-কোঁচরে এই সমস্ত টুকরো টুকরো শব্দের ঝুমঝুমিতে ভরে গেল। লাল কালো কুঁচফলের মত চোখের সামনে লাগল গতকালের স্নিগ্ধ রঙিন মুহূর্তগুলিকে। স্যাকরার নিক্তির মত ও নিজের বিবেকবুদ্ধি বিবেচনার পাল্লার একধারে সেই সব উজ্বল মুহূর্তগুলিকে বসাল আর অন্যদিকে বসাল তার একান্ত মেয়েলি বাস্তব ও সাংসারিক বোধকে। দেখল গতকালের মুহূর্তগুলির সমষ্টির ঔজ্জ্বল্য চোখ-ভরানো মন-ভরানো; কিন্তু তার ভার কম।

মহুয়া জানাল যে, তাকে আজ কুমার ও তার বাবার সঙ্গে চলেই যেতে হবে।

সুখ বাসের জানালায় বসে বাইরে চেয়েছিল। মান্দার পেরিয়ে এসেছে। একটু পর রাতু হয়ে রাঁচী পেঁছিবে সুখন। ভোর হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বাইরে চেয়ে নিদ্রাহীন চোখে অনেক কিছু ভাবছিল ও।

ভাবছিল কাল বিকেল ও রাতের কথা। ও জানে, এই ভাবনা-টুকু ছাড়া তার নিজের বলতে আর কিছুই রইবে না। সবই চুরি হয়ে যাবে। ভাবনার মধ্যে একটি মুখ, একরাশ রেশমী চুল, দুটি দীঘল কালো চোখ, চিকন চিবুক, ঠোঁটের ছোট কালো তিলটি বারে বারে বহুদিন বহু বছর তার ঘুম কাড়বে; একটা চাপা অসহায় যন্ত্রণা বোধ করবে ও সব সময়। কাজের মধ্যে তাকে অন্যমনস্ক করে দেবে। হয়তো এমনি কোনো অন্যমনস্ক মুহূর্তেই বুকে ইঞ্জিনের চাপা পড়ে তার দাদার মত সুখনও মারা যাবে। কিন্তু তবুও ভাবনাটুকু ছাড়া আর কোনো কিছুই রইবে না থাকার মত, তার নিজের বলতে।

মহুয়া মুখ-টুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে বসল।

মংলু চা দিয়ে গেছিল। রান্নাঘরের চালে বসে একটা কাক ডাকছিল।

চা-এর গ্লাস হাতে নিয়ে উদাস চোখে দূরে চেয়ে মহুয়ার মন এক বিষণ্নতায় ছেয়ে গেল।

এখানে এসেছি পরশু রাতের অন্ধকারে। আজ বোধহয় দুপুরেই চলে যাবে। সবশুদ্ধ আটচল্লিশ ঘণ্টাও নয়। অথচ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যেন চিরদিন এখানেই ও থাকত। এত সহজে, এত স্বল্প সময়ে এক একটা জায়গার উপর কি করে যে এমন মায়া পড়ে যায় তা ভাবলে আশ্চর্য লাগে।

মংলু এসে দাঁড়াল। হাসল একগাল। শুধোল, 'নাস্তা কী হবে?'

মহুয়া চমকে উঠল। হাসি পেল ওর। যেন এ ওরই সংসার। নাস্তা কী হবে, দুপুরে কী হবে এসব যেন মহুয়া না বললে চলছিল না।

মহুয়া বলল, 'মংলু, তোর ওস্তাদ কি কি খেতে ভালবাসে রে?'

মংলু অবাক হল প্রথমটা—তারপর অনেক ভেবে-টেবে বলল, 'ওস্তাদ কিছু ভাল-টাল বাসে না।' 'তারপরই বলল এঁচড়ের তরকারি।'

মহুয়া হেসে ফেলল ওর বলার ধরন দেখে। তারপর শুধোল, এখানে এঁচড় পাওয়া যায়।'

—রঙের মিস্ত্রীর বাড়িতে একটা কাঁঠাল গাছ আছে। তবে ভাল হয় না এখানে কাঁঠাল। যদি বলেন তো খোঁজ করতে পারি এঁচড় ধরছে কিনা।

মহুয়া উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'যা না এক দৌড়ে; দেখে আয়।'

-- এখন? মংলু দ্বিধায় পড়ে বলল।

— কেন, এখন যেতে অসুবিধা?'

—না। তবে বাবুরা বেড়াতে গেলেন—ফিরে এসেই তো নাস্তা করবেন, নাস্তার বন্দোবস্ত করতে হবে তো।

— সে আমি করছি। তুই যা না।

মংলু চলে গেলে মহুয়া ভাবল—যেমন বাবা, তেমন কুমার।

সব সময় কি ভাবে, কেমন করে খাবে এই ভেবেই দিন কাটিয়ে দিল।

রান্নাঘরে গিয়ে অনেকগুলো ডিম একসঙ্গে ভেঙে অমলেট বানাবে বলে কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ আদার কুঁচি এসব কেটে ফেটিয়ে রাখল। চীজ থাকলে চীজ ওমলেট বানাতে পারত। গত রাতের মুরগী ছিল কিছু; মহুয়া ও সুখন কেউই খায়নি। দুটো ঠ্যাং থেকে মাংস ছাড়িয়ে কিমা মত করে নিয়ে ও ঠিক করে রাখল। আটা মেখে রেখেছিল মংলু—লেচি বানিয়ে রাখল মহুয়া। তারপর আলু আর কুমড়ো কাটল একটা ছেঁচকি মত বানাবে। তারপর সব ঢেকে-ঢুকে রেখে সুখনের ঘরে এল।

সত্যি! খর না যেন একটা কি! একেই বোধ হয় বলে ব্যাচেলারস ডেন।

কাল সন্ধেয় সুখনের রোমশ বুকে শুয়ে থাকার সময় ও যেমন একটা উগ্র অথচ মিষ্টি গন্ধ পেয়েছিল, সারা ঘরে সেই গন্ধই ছড়িয়ে আছে। হাওয়ায় ভাসছে। বাঘের মত প্রত্যেক পুরুষের গায়েই বোধ হয় নিজস্ব গন্ধ থাকে। বাবার গায়ের গন্ধ মহুয়া চেনে। বাবার ছাড়া-জামাকাপড় ধোপাবাড়ি পাঠাতে, কাচতে দেবার সময় সে গন্ধটা চিনেছে মহুয়া। কিন্তু সুখনের গায়ে অন্যরকম গন্ধ। বুনোফুলের মত; ঝাঁঝালো।

মহুয়া ঠিক করল চলে যাবার আগে আজ নিজের হাতে সুখনের ঘরটা মনমতো সাজিয়ে দিয়ে যাবে। ফুলদানির বিকল্প, সুখনের ঘরের ভাঙা কাঁচের গ্লাসে ফুলসুদ্ধ একটা মহুয়ার ডাল আনিয়ে রেখে যাবে। মহুয়া চলে যাবার পরও যেন ওর গন্ধ থেকে যায় সুখনের গন্ধের সঙ্গে!

সুখনের খাটের উপর বসল মহুয়া। বুকের মধ্যে ভারী একটা চাপা কষ্টবোধ করতে লাগল। বাবাকে বলে সুখনের জন্য কলকাতায় একটা চাকরির বন্দোবস্ত যে করতে পারে না মহুয়া তা নয়, কিন্তু প্রথমত সুখন তা গ্রহণ করবে না বলেই মহুয়ার বিশ্বাস। দ্বিতীয়ত এই পরিবেশ থেকে—এই শাকুয়া-টুঙ, পলাশ, টুই পাখিদের এলাকা থেকে সুখনকে উপড়ে নিয়ে গেলে সুখন আর এই-সুখন থাকবে না। তা করে কোনোই লাভ নেই।

মহুয়া ভাবছিল সুখেন কি চিঠি লিখবে ওকে। যদি না লেখে। চিঠি লিখবে না সুখ? তাহলে এই হঠাৎ-নামা, হঠাৎ থাকা, হঠাৎ-হঠাৎ-ঘটা ঘটনাগুলো ঘটার কি দরকার ছিল।

কাঁচা রাস্তা ধরে গঙ্গার দিকে বেড়াতে গেছিলেন সান্যাল সাহেব ও কুমার। বেরিয়েছিলেন অনেকক্ষণ। এখন ফিরে আসছেন।

সান্যাল সাহেব বলছিলেন, 'হ্যাঁ, তোমাকে যা বলছিলাম; মাঝে মাঝে এ-রকম কষ্ট করা ভাল। এ-রকম ভাঙা টালির ঘর, নোংরা আন-এ্যাটাচড্ বাথরুম, নানারকম অসুবিধা—এতে পারস্পেকটিভরা অনেক ব্রডার হয়।'

কুমার চুপ করেছিল। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল ছোটোবেলার কথা। বস্তীর মধ্যে ওদের ঘর। দাওয়ায় বসে মুড়ি-খাওয়া। -টু হেল উইথ পারস্পেকটিভ!

কুমার কথা ঘোরাল। বলল, যাক, আপনি তখন ঠিকই বলছিলেন, রাফিং হয়ে গেল জবরদস্ত। এখন দেখুন সে ব্যাটা মিস্ত্রী আজও ডোবায় কিনা। এদিকে বেতলাতে ঘর পাওয়া গেলে হয়। এতদিন কি আর ওরা আমাদের জন্য ঘর রেখে দিয়েছে?'

সান্যাল সাহেব বললেন, 'আরে চলো, বন্দোবস্ত একটা হবে।'

কুমার বলল, 'হ্যাঁ, যেখানেই হোক এর চেয়ে অন্তত ভাল এ্যাকোমোডেশন পাওয়া যাবে।'

সান্যাল সাহেব স্বগতোক্তির মত বললেন, 'যতই ভাবছি, ব্যাপারটা খুবই অবাক করছে আমায়।'

'কোন্ ব্যাপারটা?' কুমার শুধোল।

—এই মহুয়ার ব্যাপারটা।

'কোনটা?' তাড়াতাড়ি শুধোল কুমার। একটু ভয়ও পেল। বুড়ো কি রাতে জেগেছিল নাকি?

সান্যাল সাহেব বললেন, 'মহুয়ার এই এডাপ্টেবিলিটির ক্ষমতা।'

তারপর বললেন, 'মেয়ে যে আমার এমন সুন্দর মানিয়ে নেবে তা কল্পনারও অতীত ছিল। ওর মধ্যে খুব একটা শিক্ষার জিনিস

দেখলাম ৷ জীবনের সব কিছু মানিয়ে নিয়ে, মেনে নিয়ে তার মধ্যে থেকে আনন্দ নিংড়ে নেবার ক্ষমতাটা একটা দারুণ গুণ ৷

কুমার বলল, 'তা যা বলেছেন ৷ তবে আপনি ইনডায়রেক্টলী আমাকে যা-ই বলার চেষ্টা করুন না কেন, আমি ঐ ভাঙা গেলাসের কেলে ও পুরনো-মোজার গন্ধের চা, ছারপোকা-ভরা মোড়ায় বসা—এ-সবই মানিয়ে নিতে রাজি আছি, মানিয়ে নিয়েওছি ; কিন্তু ঐ এ্যারোগ্যাণ্ট মিস্ত্রীকে মানিয়ে নিতে বলবেন না আমায় ৷'

সান্যাল সাহেব একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'জানো কুমার, যত লোক আমরা দেখি তারা কেউই খারাপ নয় ৷ এমন কি অন্ধকারতম চরিত্রের মধ্যেও একটা আলোকিত জায়গা থাকে ৷ আসল কথাটা হচ্ছে, এই আলোকিত জায়গাটা আবিষ্কার করে ফেলতে পারলে দেখবে যে, পৃথিবীতে সকলেই তোমার বন্ধু, বংশবদ ; শত্রু তোমার কেউই নয় ৷ কোনোই গুণ নেই এমন মানুষ কি কেউ আছে ? আর দোষ নেই এমনও তো কেউ নেই ৷ দোষগুলো ভুলে গুণ দেখলেই যে-কোনো মানুষের মধ্যেই একটা চমৎকার মানুষকে আবিষ্কার করা যায় ৷'

কুমার মনে মনে বলল, মাই ফুট্ ৷ বৃদ্ধ-ভাম আবার জ্ঞান দিতে শুরু করেছে ৷

কুমারের নীরবতাকে সম্মতি ভেবে ভুল করে সান্যাল সাহেব আবার শুরু করলেন, 'সেদিন আমার বন্ধু ভ্যাবলা রায়, ভ্যাবলা রায়কে চেনো তো ইনকাম ট্যাক্সের বাঘা এ্যাডভোকেট্, আমাকে একটা বই পড়তে দিয়ে গেছিল ৷ জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির লেখা ৷ বইটা পড়ে আমি রীতিমত চমকে গেছি ৷ উনি বলেছেন যে আমরা সকলেই হয় ভবিষ্যতের জন্য বাঁচি অথবা অতীতের স্মৃতি মন্থন করে, কিন্তু বাঁচা উচিত শুধু বর্তমানে ৷ কারণ বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তের মালা গেঁথেই জীবন !'

কুমার মনে মনে বলল, খেয়েছে ৷ আবার মালা-ফালা গাঁথতে লেগেছে বুড়ো ৷ সকাল থেকেই মনে হচ্ছে আজ দিনটা খারাপ যাবে ৷

একটা লোক একটা হাঁড়ি মাথায় নিয়ে টাঁড় পেরিয়ে যাচ্ছিল ৷

প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্য প্রায় বেপরোয়া হয়ে কুমার হঠাৎ তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'হাঁড়িমে কেয়া হ্যায়, তাড়ি ?'

'নেহী বাবু' ।—লোকটা অনিচ্ছাসহকারে বলল। তারপরেই সাহেবী পোশাক পরা দুজন লোককে আসতে দেখে আবগারী অফিসার-টফিসার ভেবে টাঁড় পেরিয়ে ভোঁ-দৌড় লাগল। দৌড় লাগাবার আগে বলে গেল, 'কুচ্ছু নেহী' ইসমে কুচ্ছু নেহী হ্যায়।'

কুমার তার বাঁশপাতার মত শরীর থেকে একটা বাজখাঁই আওয়াজ বের করে বলল, 'এ্যাই। ইধার আও! ইধার আও!'

লোকটা ততক্ষণে ওধারে চলে গিয়ে উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার করেছেও হয়তো বা কুমারকে সান্যাল সাহেবের হাত থেকে।

কুমার বলল, 'একটু খেজুরের রস পেলে খাওয়া যেত।'

—কোথায় আর পাবে!

তাই-ই তো ভাবছি, কুমার বলল।

মহুয়া সুখের ঘর গোছাতে লাগল। দেখতে দেখতে সুন্দর করে গুছিয়ে ফেলল ঘরটা। বিছানার চাদর, জামা-কাপড় সব বের করে বারান্দায় রাখল। আজ নিজ-হাতে কেচে দেবে যাওয়ার আগে। সুখ ওকে অনেক সুখ দিয়েছে; মনের সুখ, শরীরের সুখ। ওর জন্য এইটুকু না করলে, না করে যেতে পারলে বড়ই ছোট লাগবে নিজেকে।

সান্যাল সাহেব ও কুমার বেড়িয়ে ফিরলেন। মংলুও ফিরল হাতে একটা এঁচড় নিয়ে, কুমার দেখেই আঁতকে উঠল। বলল, 'এ কি, এঁচড় ? এঁচড় কি ভদ্রলোকে খায় ? আজ কি এঁচড় রান্না করবে নাকি তুমি ?' বলেই মহুয়ার দিকে তাকাল।

মহুয়ার আজ সকাল থেকেই ইচ্ছে করছিল যে, কুমারের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। কিন্তু কুমার কোনো সুযোগ দিচ্ছে না।

মহুয়া বলল, 'ছোটলোকরাই না-হয় খাবে, ভদ্রলোকরা না খেলেই তো হল।'

সান্যাল সাহেব বললেন, 'এই যে মংলু; তাড়াতাড়ি নাস্তা লাগাও তো বাবা। বহুত ভুখ্ লাগা হ্যায়।'

তারপর কুমারের দিকে ফিরে বললেন,'জায়গাটার গুণ আছে—জলহাওয়া খুবই ভাল—দেড়-দিনেই কেমন বেটার ফিল করা যাচ্ছে, তাই না ?'

কুমার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ। জল আর হাওয়া ছাড়া আর কিছুই তো এখানে নেই। তাই জল-হাওয়াও যদি ভাল না হতো তবে তো বিপদের কথা ছিল।'

কিছুক্ষণ পর ওরা মুখ-হাত ধুয়ে বারান্দায় বসেই নাস্তা করছিল। মহুয়া ও মংলু তদারকি করছিল। কুমার বলল,'এ-রকম প্রিমিটিভ হাউসওয়াইফের মত শেষে খাওয়ার মানে নেই। বসে পড়ো আমাদের সঙ্গে, বসে পড়ো।'

মহুয়া বলল, 'ঠিক আছে। আপনারা খান না। সামনে বসে খাওয়াতে ভাল লাগে আমার।'

কথাটা বলতে বলতেই, মহুয়ার চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে এল। কাল বিকেলে, তার সামনে মাটির দাওয়ায় আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে থাকা একজন পূর্ণবয়স্ক শিশুর কথা মনে পড়ল।

কথাটা শুনে কুমারের ভাল লাগল। ও ভাবল, কাল রাতের পরই মহুয়া ওর সঙ্গে খুবই অ্যাটাচড্ ফিল করছে। ইট ওয়াজ আ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স—যদিও একতরফা।

কুমার চোখ তুলে মহুয়ার চোখে তাকাল। বলল, উই আর রিয়েলি গ্রেট।

মহুয়া কুমারের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিল।

কাল ঘরের মধ্যে ঘুমের ঘোরের গ্লানি, লজ্জা এবং হয়তো ঘৃণাও তার মনে ছেয়ে এল। ওর মনে হল, সুখ হচ্ছে গিয়ে ডাকাত ; আর এটা একটা ছিঁচকে চোর। লুণ্ঠিতই যদি হতে হয়, তাহলে ডাকাতের হাতে হওয়াই ভাল।

হঠাৎ কুমার বলল, 'মংলু, যা তো একবার দেখে আয় তোর ওস্তাদ এল কি না। গাড়িটা যে কখন ঠিক হবে তার কোনো হদিসই পাওয়া যাচ্ছে না।'

মংলু চলে যেতেই, কুমার বলল, 'আমাদের হাবভাব দেখে মিস্ত্রী ভাবছে আমাদের এখান থেকে নড়ার ইচ্ছে নেই—কি যেন মধু পেয়েছি আমরা—এমনই মধু যে দু' বেলা বারান্দায় কাঙালী-

ভোজনের মত করে চেটেপুটে খেয়ে আমরা দিব্য আনন্দে আছি —আমাদের যেন ফ্রন্ট গীয়ার, রিভার্স গীয়ার সবই অকেজো হয়ে গেছে। একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা।'

একটু পর মংলু এসে বলল, 'ওস্তাদ ফিরে এসেছে! গাড়ির কাজ শুরু হয়েছে। ওস্তাদ নিজে তো আছেই, আরও চার-পাঁচজন মিস্ত্রী হাত লাগিয়েছে। বেলা একটার মধ্যেই গাড়ি ঠিক হয়ে যাবে।

কুমার চেঁচিয়ে উঠল। বলল, 'থ্রী চিয়ারস্ ফর মংলু। হিপ্-হিপ হুররে, হিপ-হিপ হুররে, হিপ-হিপ হুররে।'

পরক্ষণেই খুশি-খুশি গলায় হিন্দীতে বলল, 'মংলু, গরম গরম পরোটা লাও।'

সান্যাল সাহেবকেও খুশি-খুশি দেখাল। এই দেড় দিনের গতিহীনতা তাঁর মধ্যে কেমন একটা স্থবিরত্ব এনে ফেলেছিল। আবার গাড়ির সামনের সীটে বসবেন, আবার হাওয়া লাগবে চোখে-মুখে, কত নতুন পথ, মোড়, পাহাড়, বন—ভাল-লাগা। সবচেয়ে আশ্বস্ত হলেন তিনি মনে মনে এই ভেবে যে, এই সুখন মিস্ত্রীর খপ্পর থেকে মহুয়াকে উদ্ধার করে নির্ভাবনায় এবার কুমারের জিম্মায় দেওয়া যাবে। সুখন মিস্ত্রীর উপর রাগ কুমারের যতটা না ছিল, তাঁর ছিল তার চেয়েও বেশি। আসলে কুমারের খুব এ্যাডমায়ারার হয়ে গেছেন তিনি কাল রাতে সুখনকে চড় মারার পর। ছোকরার বাহাদুরী আছে। লিক্‌পিকে হলে কি হয়, মেরে তো দিল চড়। ঐ চড়টা মারবার ইচ্ছে ছিল তাঁরই। কিন্তু ছোটবেলা থেকে অন্তর ও বাহিরের মধ্যে একটা ব্যবধান রচনা করে এসেছেন তিনি। মনে যাই-ই থাক, মুখে কিছু বলেননি কখনও; কাউকেই। মন আর মুখ এক করা ব্যাপারটা তিনি মুর্খামি ও ব্যাড স্ট্রাটেজী বলেই চিরদিন বিশ্বাস করে এসেছেন।

সুখনকে কিছু বলতে পারেননি, পাছে মহুয়া তাঁকে বুঝে ফেলে। মহুয়ার চোখের সামনে তাঁকে সব সময় একটা নিরপেক্ষতার মুখোশ পরে থাকতে হয়েছে। সান্যাল সাহেব জানেন যে, অভিনয়টা তিনি ভালই বোঝেন এবং কুমার যতই লাফাক-ঝাঁপাক না কেন, বুদ্ধির জোরে তিনি কুমারকে ট্যাঁকে করে নিয়ে এক হাট থেকে

অন্য হাটে গিয়ে বিক্রি করে আসতে পারেন। ''শো অফ্ এমোশনস্' কোনো বুদ্ধির লক্ষণ নয়। সেণ্টিমেণ্ট্ এমোশন এসব বাজে বোধ তাঁর কখনও ছিল না। ঠাণ্ডা মাথায় দাবার চাল চেলে এসেছেন তিনি সব সময়—অনেক হাতী ঘোড়া নৌকো উল্টেছেন আজ অবধি।

পরোটাতে ওমলেট জড়াতে ভাবছিলেন সান্যাল সাহেব যে, একমাত্র একটা চালেই তিনি ভুল করেছিলেন জীবনে। সে শ্যামলীকে দেওয়া চাল। শ্যামলী, একমাত্র সে-ই, তাকে বড় বোকা বানিয়ে দিয়েছিল এ জীবনে। শোধ তোলার উপায়ও নেই আর।

মহুয়াকে তিনি ভালই বোঝেন। এই জেনারেশানের ছেলে-মেয়েদের জানতে তাঁর আর বাকি নেই। সুখন মিস্ত্রীকে মহুয়াই যে নাচিয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কালকে মহুয়ার অন্তর্ধানের মানে সান্যাল সাহেব বিলক্ষণ বুঝেছিলেন; প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন। মহুয়া সারা সন্ধে ঐ মিস্ত্রীর সঙ্গেই ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই সান্যাল সাহেবের। মিস্ত্রীর সঙ্গে মহুয়ার একটা এ্যাফেয়ার যে হয়েছে তা তিনি বুঝতে পারেন। কিন্তু ঠিক কতখানি গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তা উনি জানেন না—তবে কুমার যা বলেছিল তা ঠিকই। সময়টা নিশ্চয়ই খারাপ কাটেনি মহুয়ার।

এইসব কারণে, গাড়ি সরানো হচ্ছে, গাড়ি একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে, এই খবরে সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন তিনি। জীবনে পরের বউ ভাগিয়ে এনে এক স্ক্যাণ্ডাল করলেন। তারপর সেই বউ অন্য লোকের সঙ্গে চলে গিয়ে আর এক স্ক্যাণ্ডাল করল। তার উপর মেয়ে মোটর-মিস্ত্রীর সঙ্গে চলে গেলে সমাজে আর মুখ দেখাতে পারবেন না তিনি। সেদিক দিয়ে শ্যামলী তার মুখোজ্জ্বলই করেছে বলতে হবে। পালিয়েছে তো কোম্পানীর ফরাসী ডিরেকটরের সঙ্গে। চলে যাওয়ার পর লোকে বলেছে—শ্যামলীর তাহলে রূপগুণ কি একবার ভেবে দেখো! সে মেয়ে যে এতদিন তোমার সঙ্গে ছিল এই-ই তো যথেষ্ট সম্মান তোমার।

কিন্তু সেই পরিপ্রেক্ষিতে মহুয়া যদি সুখন মিস্ত্রীর সঙ্গে

এখানে থেকে যেত, তাহলে কি যে হতো ভাবতেই পারেন না সান্যাল সাহেব। স্ক্যাণ্ডাল বড় ভয় করেন তিনি। ঘোমটার নীচে খ্যামটা নাচো। জানছে কে? লোকসমাজে না জানিয়ে যা খুশি করো না। আপত্তির কোনো কারণ দেখেন না তিনি। কিন্তু এ সব কি?

মহুয়ার দিকে নরম গলায় সান্যাল সাহেব বললেন, 'এবারে চান-টান করে তাহলে তুই খেয়ে নে মা।'

তারপরেই কুমারের দিকে ফিরে বললেন, 'কখন বেরোবে ঠিক করেছ কুমার?'

কুমার বলল, 'একটায় গাড়ি ঠিক হলে, তখনই বেরিয়ে পড়া যাবে।'

'বেত্‌লা এখান থেকে ক'ঘণ্টা?' সান্যাল সাহেব শুধোলেন।

'মিস্ত্রী তো বলছিল দু-আড়াই ঘণ্টার রাস্তা।' কুমার বলল।

—তা হলে তো দুপুরটা রেস্ট করে বিকেল বিকেল বেরোলেই হয়।—মহুয়া কি বলিস?

মহুয়া নীচু, অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'আমার কিছু বলার নেই। তোমরা যা বলবে।'

কুমার খাওয়া শেষ করে বলল, 'মহুয়া তুমি চান-টান করো। ততক্ষণে আমরা গিয়ে গাড়ির কাজ একটু তদারকি করি। যা ঢিলে লোক—ওর উপর ছেড়ে দিলে আবার কি ঘটাবে কে জানে?'

সান্যাল সাহেব ও কুমার কারখানার দিকে চলে গেলেন। মহুয়া মংলুকে রান্নাঘরের বারান্দায় খেতে বসাল। মহুয়া মংলুকে ভাল করে আদর করে খাওয়াচ্ছিল। মংলু অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এ-রকম আদর-যত্নে ও অভ্যস্ত নয় মোটেই।

মহুয়া বলল, ডিমটা নে আর একটু।

মংলু বলল, আপনি না খেলে আমি খাব না।

মহুয়া ধমক দিল। বলল, 'আমি বড় না তুই বড়? কথা শুনতে হয়।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তোর ওস্তাদ রাতে কিছু খেয়েছে?'

—নাঃ। জর্দা পান শুধু।

—একটু পরে গিয়ে ওস্তাদকে ডেকে আনবি। তোর ওস্তাদ খেলে তবে আমি খাব।

মংলু বলল, 'আমি যেতে পারব না। আমাকে মারবে ওস্তাদ। তার উপর তোমাদের সঙ্গের ঐ বাবু থাকবে তো সঙ্গে—কে যাবে ওর সামনে?'

'আমি চিঠি দিয়ে দেব তোর ওস্তাদকে। আমার চিঠি পেলে নিশ্চয়ই আসবে।' আত্মবিশ্বাসের গলায় বলল মহুয়া!

মংলু বলল, 'তা আসবে। আপনি আসতে বললে আসবে।'

একটু পর মংলু বলল, 'দিদিমণি, আপনি থেকে যান না এখানে?'

মহুয়া বলল, 'এ কথা বলছিস কেন?'

মংলু বলল, আপনাকে খুব ভাল লেগেছে বলে। আর জানেন দিদিমণি আপনার কথা ওস্তাদ যা শোনে আর কারো কথাই তেমন শোনে না। আপনি থাকলে ওস্তাদ আর সকলের উপর ওস্তাদি করতে পারবে না। 'ওস্তাদেরও একজন ওস্তাদ হবে।'

মহুয়া চোখ দিয়ে হাসছিল, বলল, 'আমি কোথায় থাকব।'

—কেন? তোমরা যে ঘরে আছ এখন, সে ঘরে। তুমি দেখো তোমার কোনো অযত্ন করব না আমরা। দুপুরে রোজ আমি আর তুমি লুডো খেলব। খুব মজা হবে, তাই না?

'হুঁ।' মহুয়া বলল। তারপর বলল, থাকতে পারলে বেশ হতো।

মংলুর খাওয়া হয়ে গেলে, মহুয়া সুখের ঘর থেকে কাগজ আর ডট্ পেন নিয়ে একটা চিঠি লিখল—

"সুখ,

আপনার জন্য খাওয়ার নিয়ে বসে আছি আপনার ঘরে। একবার এখুনি আসবেন!

মংলু মুখ-টুখ ধুয়ে চিঠিটা নিয়ে কারখানায় চলে গেল। তারপর ওস্তাদকে ডেকে নিয়ে চিঠিটা দিল।

সুখন চিঠিটা পড়েই ছিঁড়ে ফেলল। সুখনের না-কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, রোদে মাটিতে ধুলোতে ঘামে বিচ্ছিরি চেহারা, রাত-জাগা লাল-লাল চোখ দেখে মংলু ভয় পেল।

সুখন বলল, 'এখন সময় নেই কোথাও যাবার। আগে গাড়ি সারাব ঃ তারপর অন্য। বলে দিস গিয়ে।'

মংলু আর কথা বাড়াল না। মহুয়াকে এসে সব বলল।

মহুয়া ভীষণ ক্ষুব্ধ হল। মহুয়া ভেবেছিল, তার নিজের হাতের লেখা চিঠি এবং নিরিবিলিতে তারই একা-ঘরে আমন্ত্রণ জানাবার মান বুঝবে সুখ। মহুয়া অনেক কিছু কল্পনাও করে নিয়েছিল। কল্পনা করেছিল যে, সুখ ঘরে ঢুকেই তার সবল হাতে ওকে জড়িয়ে ধরবে, আদর করবে ঃ মহুয়া ভাল লাগায় মরে যাবে।

খুব রাগ হল মহুয়ার।

মংলু সুধোল, 'যাবেন না দিদিমণি? চলুন, আপনার খাবার দিই।'

মহুয়া বলল, 'না। কিছু খাবো না আমি। আমাকে এক কাপ চা করে দে তো মংলু।'

একা ঘরে, সুখনের ঘরময় পায়চারি করতে করতে অভিমানে মহুয়ার দু চোখ জলে ভরে এল। লোকটা সত্যিই জংলী, অভদ্র ; মেয়েদের সম্মান করতে জানে না।

চা-টা খেয়ে, মহুয়া এক সময় এঁচড়ের তরকারিটা নিজে হাতে রাঁধবে বলে রান্নাঘরে গেল। ঠিক করল তরকারি রেঁধে তারপর ভিজোনো কাপড়গুলো কেচে দেবে!

সুখন ও আরও তিনজন মিস্ত্রী কাজ করছিল। মিস্ত্রীরা যত তাড়াতাড়ি পারে হাত চালিয়ে কাজ সারছিল। কারখানার মধ্যে নিমগাছের ছায়ায় একটা ভাঙা মাডগার্ডের উপর বসে কুমার তদারক করছিল কাজের।

একটা ছোকরা মিস্ত্রী বনেটের উপরে রাখা রেঞ্জটা তুলে নেবার সময় হাত ফসকে সেটা বনেটের উপর পড়ে যেতেই সেখানের রঙটা সামান্য চটে গেল এবং একটা টোল মত পড়ে গেল।

কুমার এক লাফে এগিয়ে বলল, করেছ কি? এটা কি হল? এই যে কলকাতার মীর্জার গ্যারেজ থেকে রঙ করিয়ে নিয়ে এলাম সদ্য, আর রঙ যে চটালে বড়? যত সব গেঁয়ো উজবুক-বুড়বাকের দল।'

ছোকরা মিস্ত্রীটা লাল চোখে একবার তাকাল কুমারের দিকে, কিন্তু কিছু বলল না। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সেই মিস্ত্রীর হাত থেকে আবারও রেঞ্জটা বনেটের উপর পড়ল।

কুমারের মনে হল মিস্ত্রীটা যেন ইচ্ছে করে এবং আছাড় মারার মত জোরে ঐ ভারী রেঞ্জটাকে ফেলল। রেঞ্জটা পড়তেই একটা বড় টোল পড়ল বনেটে।

কুমার দৌড়ে এসে বলল, বাস্টার্ড!'

কথাটা বলতেই, ছোকরা মিস্ত্রীটা এক লাফে চিতাবাঘের মত এসে পড়ল কুমারের ঘাড়ে। তারপর এক বেদম চড় কষাল কুমারের গালে।

চড় কষাতেই কুমার থতমত খেয়ে পিছিয়ে গেল। সমস্ত কারখানার মিস্ত্রীরা কাজ থামিয়ে ঐদিকে চেয়ে রইল। দু'-একজন এগিয়েও এল।

ছোকরা মিস্ত্রী বলল, 'আর একটা কথা বলেছ তো পেঁয়াজী বার করে দেব। শালা তেল দেখাতে এসেছ এখানে? দু'দিন ধরে তেল দেখাচ্ছ। এ জায়গার নাম ফুলটুলিয়া। এ তোমার কলকাতা নয়। এখানে মেরে, গুঁড়িয়ে তোমার এ্যাশ ধরিয়ে দেবো বুড়োর হাতে। কোথায় খাপ খুলতে এসেছ জানো না।'

মিস্ত্রীদের সকলের মুখ-চোখের অবস্থা দেখে কুমার নিজের দামী টেরীকটের প্রিন্টের শার্টের মধ্যে ধুকপুক করা কলজেটাকে গুটিয়ে নিল।

ওর মুখ শুকিয়ে গেছিল। চড়টা বড় জোর মেরেছে ছোকরা। মনে হচ্ছিল ওর গালে কেউ লঙ্কাবাটা লাগিয়ে দিয়েছে; এমনই জ্বলছিল গালটা।

ছোকরা মিস্ত্রী আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় সুখন জলদ-গম্ভীর গলায় বলল, 'এ রামলাল, মেরে তোর খুপরী খুলে নেবো, কারখানার মধ্যে দাঁড়িয়ে খদ্দেরের গায়ে হাত? তোরা ভেবেছিস কি? আমি কি মরে গেছি।'

তারপর কুমারের দিকে ফিরে কালিমাখা হাত দুটো জোড় করে বলল, 'মাপ করে দেবেন। আমি ওর হয়ে মাপ চাইছি। রেঞ্জটা ওর হাত থেকে অ্যাকসিডেন্টালি পড়ে গেছিল। যাই-ই

হোক, আমি ক্ষমা চাইছি।'

সান্যাল সাহেব এতক্ষণ ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে এগিয়ে এসে সেই ছোকরা মিস্ত্রীটির কাছে গিয়ে নরম গলায় বললেন, 'তুমি বড় ছেলেমানুষ ভাই। অত সহজে মাথা গরম করে? তার পর কুমারের দিকেও ফিরে বললেন, 'উই আর ভেরী আপসেট। এসো, এসো। বসে একটা সিগারেট খাও কুমার। ডোণ্ট গেট একসাইটেড। যা হবার তা হয়ে গেছে।'

কুমার সরে আসতে বলল, 'আই উইল টিচ দিজ বাস্টার্ডস্ আ গুড লেসন্—'

কুমারের কথা শেষ হবার আগেই সেই ছোকরা-মিস্ত্রীটি আবার মুহূর্তের মধ্যে উড়ে এসে কুমারের পেছনে কষে এক লাথি লাগাল। লাথি লাগিয়েই বলল, 'শালা তোর মাকে ডাক। এ জন্মের মত চারদিক দেখে নে ভাল করে—নাক ভরে মহুয়ার গন্ধ শুঁকে নে - তোর আজই শেষ দিন।'

সুখন এবার দৌড়ে গিয়ে ওদের মধ্যে পড়ল। পড়ে ওকে টেনে আনল জামার কলার ধরে। বলল, 'বড় রঙবাজ হয়েছিস তো তুই! আমি বারণ করা সত্ত্বেও তুই এমন করছিস?'

ছোকরা বলল, 'তুমি ঠিক করছ না ওস্তাদ। আমরা কি মানুষ নই? ও শালা যা-তা গালাগালি করছে কেন ফের?'

সান্যাল সাহেব দেখলেন পরিস্থিতিটা এমন হয়ে যাচ্ছে যে তাঁর মত বিচক্ষণ মাথাঠাণ্ডা লোকের পক্ষেও এটা নিয়ন্ত্রণ করা খুব মুশকিল হয়ে পড়ছে। তিনি হাত জোড় করে থিয়েটারী কায়দায় দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, ভাই সব, আমি এর হয়ে ক্ষমা চাইছি। রাগের মাথায় একটা অন্যায় কথা বলে ফেলেছে। এর মাথা খারাপ হতে পারে, আমার তো হয়নি—আমি একে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।' বলেই তিনি কুমারকে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোতে লাগলেন।

যেতে যেতে সান্যাল সাহেবের হাত-ধরা অবস্থাতেই কুমার আবারও চিৎকার করে হাত নাড়িয়ে গিলে-ফেলা অপমানটার হজমী দাওয়াইয়ের মত বলল, আমি তোমাদের দেখে নেব স্কাউন্ড্রেলস—পুলিশ না এনেছি তো আমার নাম নেই। এই

ওস্তাদ সমেত সবগুলোকে আমি জেলে…।'

কথা শেষ করার আগেই সান্যাল সাহেব কুমারের মুখ চেপে ধরলেন।

কিন্তু মুখ চাপার আগেই মুখনিঃসৃত আওয়াজ মিস্ত্রীদের কানে পেঁাচেছিল। পেঁাছতেই একই সঙ্গে চার পাঁচজন মিস্ত্রী ওদিকে দৌড়ে গেল। পুরোভাগে সেই ছোকরা মিস্ত্রীটি। তার হাতে একটা বড় রেঞ্জ—যে রেঞ্জ নিয়ে সে এতক্ষণ কাজ করছিল।

সুখন বিদ্যুৎবেগে তাদের আগে গিয়ে পেঁাছল। বলল, 'কি করছিস রামলাল, কি করছিস; ছেড়ে দে ছেড়ে দে।'

কিন্তু সুখনের কথা শেষ হবার আগেই রামলালের ডান হাতটা রেঞ্জ সমেত ডান কাঁধের উপরে উঠে গেছিল। ততক্ষণে সুখন কুমারের পাশে গিয়ে পেঁাচেছে।

রামলালের হাতটা যখন প্রচণ্ড জোরে নেমে আসতে লাগল কুমারের মাথা লক্ষ্য করে, কুমার কুকুরের মত ভয় পেয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে মাথাটা নীচু করে সুখনের দু হাঁটুর মধ্যে ঢুকিয়ে বসে পড়ল মাটিতে।

মুহূর্তের মধ্যে রেঞ্জটা এসে পড়ল সুখনের কপালে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। দেখতে দেখতে রক্তে সুখনের মাথা, চোখ-মুখ, জামা-কাপড় সব ভিজে গেল। সুখনের মাথার রক্ত দেখেই রামলাল রেঞ্জটা ফেলে দিয়ে সুখনকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনুতপ্ত গলায় বলল, 'হা রাম, ম্যায় কা কিয়া ওস্তাদ, ম্যায় ক্যা কিয়া।'

সুখনের চোটটা মারাত্মক হয়েছিল। সুখন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় রামলালের কাঁধে ভর করে ঝুঁকে পড়ল। নইলে মাটিতে পড়ে যেত ও। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মিস্ত্রীরা সুখনের সেই ছ্যাকরা গাড়িটা বের করে নিয়ে তাকে চক্তকের কম্পাউণ্ডার বাবুর কাছে নিয়ে যাবে বলে বেরোল।

রামলাল সঙ্গে গেল। শেষ মুহূর্তে সান্যাল সাহেবও দৌড়ে এসে সার্কাসের ক্লাউনের মত গাড়ির পা-দানিতে উঠে পড়লেন।

স্ট্র্যাটেজিক এবং টাইম্‌লি মুভ্‌।

গাড়িটা ছেড়ে দিতেই রামলাল জানালা দিয়ে মুখ বের করে

কুমারকে বলল, 'ফিরে আসছি। তোমাকে শেখাব ফিরে এসে।'

সুখন গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'গাড়ির কাজ যেন বন্ধ না হয়—ও গাড়ি যত তাড়াতাড়ি পারো রেডি করো; আমি আসছি।'

মংলু গোলমাল শুনে কারখানায় দৌড়ে এসেছিল। মহুয়াও কাপড় কাচা ছেড়ে এসে ভিজে কাপড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। মংলু এক দৌড়ে আবার ফিরে গিয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে মহুয়াকে সব বলল।

কুমার ভয় ও আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে টলতে টলতে ফিরে এসে ঘরের মধ্যে দিনদুপুরেই হুইস্কীর বোতল খুলে বসল।

মহুয়া খোলা দরজায় কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। চিড়িয়াখানায় লোকে যেমন ওরাদের ফাঁক দিয়ে জংলী জন্তু দেখে, তেমন চোখে পূর্ণদৃষ্টিতে কুমারকে দেখল অনেকক্ষণ ধরে। মুখে কোনো কথা বলল না। তারপর ফিরে গিয়ে আবার কাপড় কাচতে লাগল।

কারখানার মিস্ত্রীরা বলল—এটা এ্যাকসিডেণ্ট। কিন্তু ওস্তাদ যেমনভাবে বারবার অন্যায়কে সমর্থন করছিল, ওস্তাদকে মিস্ত্রীরা সকলে মিলেই এক সময় মারতে বাধ্য হতো। আজ রামলালের হাত দিয়ে এ্যাকসিডেণ্ট হয়ে ভালই হয়েছে। ওস্তাদ ভবিষ্যতে অন্যায়কে আর মদত দেবেন না।

একজন বয়স্ক মিস্ত্রী বলল, 'আরে ওস্তাদের ভীমরতি ধরেছে। অনেক ব্যাপার আছে।' বলেই, এদিক ওদিক চেয়ে গলা নামিয়ে বলল, 'ঐ সুন্দর বাঙালী মেয়েটার সঙ্গে ওস্তাদ ফেঁসে গেছে। শ্বশুরালের লোকের সঙ্গে লোক কি খারাপ ব্যবহার করে? না করতে পারে?'

সেই মিস্ত্রীর কথা শেষ হতে না হতে অন্য মিস্ত্রীদের মধ্যে চার-পাঁচজন সমস্বরে বলল, 'এই গফুর, সাবধানে কথা বল। আমরা তোর মুখ ভেঙে দেবো। শালা নেমকহারাম। ওস্তাদ না থাকলে এতদিন যক্ষ্মায় মারা যেতিস, এই তোর কৃতজ্ঞতাবোধ! তুই শালা এক নম্বরের নেমকহারাম।'

কম্পাউণ্ডার ইঞ্জেকশন দিয়ে ভাল করে ড্রেসিং করে ব্যাণ্ডেজ

বেঁধে দিয়ে বললেন, 'বশ, সাবধানে থাকতে হবে। কাজকর্ম ক'দিন বন্ধ। কোনো রকম স্ট্রেইন নয়। একেবারে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে দিনকয়েক।' সঙ্গে আরো কি সব ওষুধ-টষুধ দিলেন খাওয়ার জন্য।

সুখন যখন ফিরে এলো কারখানায়, তখন রামলালও গাড়ি থেকে নেমে কানে হাত দিয়ে নিজের থেকেই ওঠ-বোস করল। বলল 'ওস্তাদ, মাপ করে দাও ওস্তাদ।'

সান্যাল সাহেব কম্পাউণ্ডার বাবুকে টাকা দিতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু মিস্ত্রীরা দিতে দেয়নি। এখন কারখানায় ফিরে এসে সান্যাল সাহেব বেশ কিছুক্ষণ মিস্ত্রীদের সঙ্গে থাকলেন। এমন কি কখনও যা করেন না তাই করলেন। এক মিস্ত্রীর দেওয়া দুটো পান টিপিক্যাল কেরানীর মত খেলেন। একজনের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে বিড়িও খেলেন একটা। যখন ওঁর মনে হল অবস্থা সম্পূর্ণ শান্ত তখন উনি বাড়ি যাবেন বলে পা বাড়ালেন। চলে যাবার আগে সুখনকে বললেন কাঁধে হাত দিয়ে আপনি বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়বেন চলুন।

সুখন গাছতলায় মাটিতে বসেছিল। বলল, 'আমি ঠিক আছি।' তারপর বলল, আপনি যান। আমাকে থাকতে হবে। আপনাদের গাড়ির কাজ শেষ হয়নি এখনও।'

সুখনের মুখ দেখে মনে হল ওর খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে ওর।

সান্যাল সাহেব বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

কুমার চান-টান করেনি। অপমানটা তখনও হজম হয়নি ওর। সান্যাল সাহেব চান করে নিলেন। মহুয়াও আগেই চান করেছিল। রান্নাও হয়ে গেছিল। ওরা খেতে বসবে, এমন সময় সান্যাল সাহেবের হুঁশ হল যে মহুয়া ঘরে নেই। মংলুও নেই।

মহুয়া আর মংলু দুজনেই সুখনকে ধরে নিয়ে আসবার জন্য কারখানায় গেছিল। সুখন পা ছড়িয়ে নিমগাছে হেলান দিয়ে বসে খুব মনোযোগের সঙ্গে গাড়ি মেরামতের কাজ দেখছিল।

হঠাৎ সমস্ত মিস্ত্রীর কাজ থামানো দেখে ওদের চোখ অনুসরণ করে সুখন দেখল যে, মহুয়া আর মংলু বেড়ার কাছে দাঁড়িয়েছে এসে।

সুখন মহুয়াকে দেখে হাসল।

হাসতে ওর কষ্ট হচ্ছে, পরিষ্কার বোঝা গেল।

মহুয়া এগিয়ে এসে আদেশের স্বরে বলল, আপনাকে এখন ঘরে যেতে হবে।'

এই আদেশের স্বরে সুখন অভ্যস্ত নয়। ও জানে, ওর মধ্যে একটু জানোয়ার বাস করে, যে কখনই কারো আদেশেরই ধার ধারেনি। আদেশের গলায় কেউ কথা বললেই ওর রক্ত মাথায় চড়ে যায়। সে যেইই হোক।'

সুখন ইশারায় মিস্ত্রীদের কাজ করতে বলল। মাথায় রক্ত ফুটে-ওঠা ব্যাণ্ডেজে-বাঁধা সুখনের সে চেহারা দেখে মহুয়ার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল!

সুখন মংলুর হাত ধরে উঠে, বেড়ার বাইরের একটা শিশু-গাছের তলায় এসে দাঁড়াল। বলল মংলু একটু চা করে নিয়ে আয় আমার জন্য; দৌড়ে যা।'

মংলু চলে যেতেই মহুয়া আবার বলল, 'আপনাকে এখন ঘরে যেতেই হবে।'

সুখনের মনে হল, মহুয়ার গলার স্বরে একটা গর্ব ঝরে পড়ছে। সুখনের জীবনে বোধ হয় এর আগে ভালোবেসে আদেশ করার মত কোনো লোক আসেনি। মনে মনে ক্ষমা করে দিল সুখন মহুয়াকে।

সুখন বলল, 'ঘর মানে কি শুধুই একটা টালির ছাদ? ঘর মানে তো তার চেয়ে অনেক কিছু বেশি। ঘর মানে, ঘর মানে।'

তারপর একটু থেমে বলল, 'এই-ই আমার ঘরবাড়ি, এই-ই আমার সব; এই কারখানা আর মিস্ত্রীরা।'

মহুয়া অভিমানের গলায় বলল, 'সকালে আসতে বলে চিঠি লিখে পাঠালাম, এলেন না কেন? কাল দুপুর থেকে খাননি। তার উপর এমন কাণ্ড।—কী যে করেন ভালো লাগে না।

আপনার দিকে তাকাতে পারছি না আমি। বাঁচাতে গেলেন কেন এমনি করে অন্যকে ?'

তারপরই বলল, 'না। আমি কোন কথাই শুনব না। আপনাকে এখন আমার সঙ্গে যেতেই হবে। আমি নিজ হাতে আপনার জন্য এঁচড়ের তরকারি রান্না করেছি। আপনাকে আসতেই হবে। খেতেই হবে। রান্না কখন হয়ে গেছে ; খেয়েদেয়ে ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকতে হবে। এই বলে দিলাম।'

'যেতেই হবে ?' সুখন বলল। তারপর একটু হেসে বলল, 'কিসের এত জোর আপনার আমার উপর ?'

—তা আমি জানি না। কিন্তু আমি জানি যে, আমার অনুরোধ আপনি ফেলতে পারবেন না।

সুখন অদ্ভুত হাসি হাসল। বলল, জানেন ? জানেনেই যদি ; তাহলে এত দ্বিধা কেন নিজের সম্বন্ধে ?'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'যান, লক্ষ্মী মেয়ে ফিরে যান, রোদ লেগে আপনার সুন্দর মুখটা লাল হয়ে গেছে। আর চলে যাওয়ার আগে চুপ করে এখানে একটু দাঁড়ান দেখি। কথা বলবেন না, নড়বেন না একটুও ; আপনাকে শেষবারের মত ভালো করে দেখি একবার।'

মহুয়া লজ্জা পেল, খুশি হল এবং খুব দুঃখিতও হল। বলল, 'তাহলে আপনি আসছেন না ?'

নাঃ।—বলল সুখন। বলেই মহুয়ার চোখের দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে তাকাল।

হেরে-যাওয়া অপমানিত হওয়া মুখে চোখ-নামিয়ে মহুয়া বলল, আমরা একটু পরেই চলে যাবো কিন্তু।

সুখন বলল, জানি।

—তবুও আসবেন না ? আমার ঠিকানা নেবেন না আপনি ?

—না।—কাটাভাবে বলল সুখন।

—আপনি ভীষণ খারাপ, পচা আপনি। আপনি বড় দাম্ভিক, অবাধ্য।

সুখন নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল, হয়তো তাই।

মহুয়ার চোখ ছলছল করে উঠল।

আবারও বলল, আপনি সত্যিই আসবেন না ?

—না। এখন যেতে পারি না। অনেক কাজ। যাওয়া সম্ভব নয়।

মহুয়া বলল, 'আমি চললাম তাহলে। আর কিন্তু দেখা হবে না।'

সুখন বলল, দাঁড়ান।

হটাৎই ওর গলার স্বরটা কেমন কেঁপে গেল। সুখন বলল, 'অমন করে যেতে নেই। একটু হাসুন তো দেখি। এই হাসি আবার কবে দেখতে পাব—পাব কিনা তাই-ই বা কে জানে ? লক্ষ্মীটি, একবার হাসুন শেষবার।'

মহুয়া বলল, ইয়ার্কি, না ? বলেই, হেসে ফেলল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কেঁদেও ফেলল। ওর গাল গড়িয়ে জলের ফোঁটা নামল।

সুখনের বুকের মধ্যেটা হুহু করে উঠল। কিন্তু এখন কিছুই করবার নেই। মহুয়া ছেলেমানুষ নয়। এখন দিনের সুস্পষ্ট আলো, কত লোকজন ; বুদ্ধি-বিবেচনা চারদিকে। কাল জঙ্গলের নির্জনতায় চাঁদের আলোয় যে ছেলেমানুষী ভুল করেছিল, আজ তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। ও যে মহুয়াকে এক দারুণ ভালবাসা বেসে ফেলেছে। সুখন যে মহুয়ার ভাল চায়।

সুখন চুপ করে মহুয়ার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মহুয়ার দু'চোখ জলে ভরে এল। মহুয়া আর দাঁড়াল না। বলল, 'অসভ্য ! আপনি একটা জংলী।' বলেই মহুয়া চলে গেল।

যতক্ষণ না মহুয়া বেড়ার আড়ালে চলে যায়, ততক্ষণ সুখন তার সুন্দর চলার ভঙ্গীর দিকে চেয়ে রইল ! মহুয়ার প্রতি মঙ্গল-কামনায়, ভালোলাগায়, ভালোবাসায়, তার সুস্থ, বয়স্ক দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন মনঃকোণায় কাণায় ভরে উঠল এবং সেই সঙ্গে ওর মনের মধ্যে যে ছেলে-মানুষটাও বাস করে, সেই মানুষটা ধুলোর মধ্যে পা-ছড়িয়ে বসে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সে কান্না শোনা গেল না।

কুমার চান করে উঠেও ঘরে বসে হুইস্কী খাচ্ছিল। সান্যাল সাহেব মানা করছিলেন। বলেছিলেন, 'এই গরমে কি করছ এ

সব ? এখন মানে-মানে এখান থেকে রওনা হওয়া গেলেই বাঁচা যায়। আবার হুইস্কী খেয়ে কাকে ঘুষি মেরে বসবে, তখন আর প্রাণ বাঁচানোর উপায়ই থাকবে না।'

হুইস্কীর দয়ায় কুমারের হারানো বিক্রম আবার ফিরে পেয়েছে ও। কুমার বলল, 'প্রাণ যাওয়া অতই সহজ কিনা? নেহাত মেয়েছেলে সঙ্গে আছে নইলে দেখে নিতাম এদের।'

সান্যাল সাহেব মনে মনে বললেন, এ যাত্রা মহুয়া সঙ্গে আছে বলেই বেঁচে গেলে, নইলে তোমাকে কে বাঁচাত তাই-ই দেখতাম। মুখে বললেন, 'সব তো মিটে গেছে, আর তো কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। আর পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা কেন?'

মহুয়া ফিরে আসতেই সান্যাল সাহেব বললেন, 'কোথায় গেছিলি?'

—এই একটু দেখে এলাম গাড়ির কতদূর।

মহুয়ার চোখ ভেজা—বৃষ্টির পরের জঙ্গলের মত। সান্যাল সাহেব ঘাঁটালেন না ওকে। বললেন, 'কি দেখলি?'

—প্রায় হয়ে এসেছে।

বলেই মহুয়া অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সুখনের ঘরের দিকে চলে গেল।

তাহলে তো এবার বিল-টিল মিটিয়ে দিতে হয়। গোছগাছ করে নে মহুয়া—এখুনি রওনা হবো।—সান্যাল সাহেব বললেন।

ততক্ষণে মহুয়া সুখনের ঘরে ঢুকে গেছে। কুমার বলল, 'এখুনি পালাবার কি হয়েছে? আমরা কি ভয় পেয়েছি নাকি?'

কুমারের গলার স্বর শুনে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, সে বিলক্ষণ ভয় পেয়েছে।

কুমার আবার বলল, 'খেয়ে-দেয়ে রেস্ট নিয়ে এক কাপ করে চা খেয়েই বেরোনো যাবে। তা ছাড়া অ্যাট দ্য মোমেণ্ট আই অ্যাম নট ফিজিক্যালি ফিট টু ড্রাইভ।'

মহুয়া সুখনের ঘরে ঢুকেই বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। বাইরে দড়িতে কেচে-দেওয়া সুখনের জামা-কাপড়, বিছানার চাদর, টেবল-ক্লথ সব শুকোচ্ছিল। যা কড়া রোদ—একটু পরেই তুলে নেওয়া যাবে। ভাবল মহুয়া। সব তুলে এনে সুখনের ঘরটা

সুন্দর করে আবার সাজিয়ে দিয়ে চলে যাবে ও।

মহুয়া ভাবছিল যে, ও এই ঘরের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে চেয়েছিল, যদি সুখন তাকে একটু জোর দিত। লোকটা অদ্ভুত। নিজে ভালোবাসতে জানে ভীষণ, অথচ অন্যের ভালোবাসা নিতে জানে না। সমস্ত সুখ তার নিজের ভালবাসার ক্ষমতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অন্যকে ভালোবাসতে দিতে জানে না। তাকে ভালোবেসে, তার জন্য কিছু করে অন্যের যে সুখ, সেই সুখ থেকে সে বঞ্চিত করতে চায় অন্যকে। বড় দাম্ভিক লোকটা। স্বার্থপরও হয়তো বা। কিন্তু এমন একটা অদ্ভুত লোককেই বা ওর এমন করে ভালো লেগে গেল কেন?

কিছু ভালো লাগে না মহুয়ার। মহুয়ার কিছুই ভালো লাগে না।

এত করে যত্ন করে রান্না করল, মুখের উপর বলে দিল যে আসবে না; খাবে না। কপাল দিয়ে এখনও রক্ত চোঁয়াচ্ছে—তবুও বলল আসবে না।

মহুয়া নিজের মনে, জল-ভেজা চোখে অঝোরে বলে চলল—তুমি যে ঘর চাও সে ঘর তোমাকে কেউ দিতে পারবে না সুখ। তোমার চিরজীবন এমনি একাই থাকতে হবে। সুখি হতে হলে সাধারণ হতে হয়, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন লোভী হতে হয়, কুমারের মত; ছোট্ট মাছরাঙা পাখির মত। বারে বারে জলে ছোঁ মেরে মেরে সুখের ছোট ছোট মাছ কুড়িয়ে এনে জড়ো করে সুখের ডালি ভরাতে হয়। তুমি সমস্ত সুখকে একেবারে কব্জা করতে চাও, তাই-ই তো তোমার আঁজলা গলে সব সুখই গড়িয়ে যাবে। কোনো মহুয়াকেই ধরে রাখতে পারবে না তুমি। হয়তো ধরে রাখতে চাও-না। জানি না। বুঝলাম না তোমাকে।

মহুয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুখনের বিছানায় নড়েচড়ে শুয়ে মনে মনে বলল—তোমাকে আমি সব সুখ দিতাম সুখ, স—ব সুখ ঃ কিন্তু তুমি মহুয়াকে দাম দিলে না। দম্ভ ভরে তাকে ফিরিয়ে দিলে। ঠিক আছে। তুমি নিষ্ঠুর হৃদয়হীন হতে পারো, আর—আমিই কি পারি না? তুমি দেখো, খাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করব না। সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে যখন

দেখবে, ঘরময় আমার হাতের ছাপ, মহুয়ার গন্ধ, চারদিকে আমি, টুকরো টুকরো আমি, তখন দেখব তুমি কাঁদো কি না আমার জন্য। দেখব তখন।

আমি তোমাকে স—ব দিলাম। আর তুমি আমার শেষ অনুরোধের দামটুকুও দিলে না! জংলী।

॥ দশ ॥

গোছগাছ করার বিশেষ কিছুই ছিল না। যা নামিয়েছিল, সেগুলোই স্যুটকেসে ভরে নেওয়া। চটিটটি তো পেছনের সীটের পায়ের কাছেই রাখা যাবে।

মহুয়া দুপুরে ঘুমোয়নি। খায়ওনি। খিদে পেয়েছিল প্রচণ্ড। তবুও খায়নি। না-খাওয়ার আর কোনোই কারণ ছিল না। শুধু একমাত্র কারণ ছিল, জেদী, একগুঁয়ে লোকটা রাতে ফিরে এসে জানতে পারবে মংলুর কাছে যে, সে নিজে না খেয়ে মহুয়াকেও অভুক্ত রেখেছিল। লোকটাকে বড় দুঃখ দিতে ইচ্ছা করে, কাঁদতে ইচ্ছা করে; যেমন করে সে কাঁদাল ওকে।

বাবা ও কুমার তখনও ঘুমোচ্ছিলেন! সত্যি, ঘুমোতেও পারেন! আর এই কুমারের মত লোকরা কেন যে বাইরে আসে তা মহুয়ার জানা নেই। শুধু খেতে, হুইস্কী খেতে; আর দরজা বন্ধ করে তাস খেলতে। বন্ধ দরজার বাইরে যে এমন একটা দারুণ সুন্দর মর্মরধ্বনি তোলা পৃথিবী পড়ে রয়েছে তার দিকে এদের চোখ নেই। এদের চোখ হয়তো আছে, কিন্তু দেখার শক্তি নেই। চোখের লেন্সে ক্যামেরার লেন্সের মত অব্যবহারে ফাঙ্গাস পড়ে গেছে। এদের কানে ট্রাম-বাস-গাড়ির শব্দ তালা লাগিয়ে দিয়েছে। অলস মন্থর হাওয়ায় পাথরের উপর শুকনো পাতা গড়ানোর চলমান ছবি এদের চোখে পড়বে না। দূর থেকে ভেসে আসা মৌটুসী পাখির চিকন গলার স্বর এদের কানে কখনও পেঁছবে না।

এই স্নিগ্ধ মধুর অপরূপ পটভূমিতে তাই-ই তো ঐ আশ্চর্য লোকটা এমন করে আকৃষ্ট করেছিল তাকে, অমন শিহর ভরে পুলক তুলে ডাক দিয়েছিল তার বুকে, তার প্রাণের প্রাণে, তার শরীরের কেন্দ্রবিন্দুতে সে লোকটা সমস্ত সুখকে কেন্দ্রীভূত করেছিল।

বাইরে হাওয়ার বেগ কমে এসেছে। রাস্তার ওপারের টাঁড় থেকে তিতির ডাকছে ক্রমাগত। শালবন থেকে টিয়ার ঝাঁকের চমকে-দেওয়া ট্যাঁ ট্যাঁ রব ভেসে আসছে।

বড় উদাস, বিধুর এই সময়টা। এই বিধুর ভাবটা মহুয়ার মনের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে। এখন মহুয়া প্রস্তুত। শরীরে ; মনেও।

যাওয়ার সময় হয়েছে। সুখনের ঘর গোছানো শেষ। মংলুকে দিয়ে মহুয়ার ডাল ভাঙিয়ে নিয়ে এসে ঘরে রেখেছে। রাতে এ ঘর মহুয়ার উগ্র গন্ধে ভরে যাবে। সুখনের গায়ের গন্ধ উগ্র। মহুয়া চেয়েছিল ওর নিজের স্নিগ্ধ সত্তার হালকা বাস রেখে যাবে না সুখনের জন্য।

মহুয়া ফুলের গন্ধের সঙ্গে মানবী মহুয়ার শরীর-মনের গন্ধের মিল নেই।

মহুয়া জানে, এ ছাড়া সুখের জন্য রেখে যাবে এমন কিছুই ওর নেই। তবুও ও জানে, জাগতিক কিছু রেখে যাবে বলেই ও অনেক কিছু রেখে যাবে এখানে। ওর জীবনের এক আশ্চর্য সুরেলা, সুখ ও বিষণ্ণ অভিজ্ঞতার স্মৃতি।

বাইরে হাওয়াটা সারা দুপুর পাতা উড়িয়ে, পাতা ঝরিয়ে মন্থর হয়ে এসেছে। বেলা পড়ে আসছে।

না। লোকটা সত্যিই এল না। গাড়ি সারানোর পর কোথায় যেন চলে গেছে। শাকুয়া-টুঙে? কে জানে? এখন শাকুয়া-টুঙ থেকে সামনের উপত্যকাটা কেমন দেখাচ্ছে? একদিকে চাতরার জঙ্গল, সোজা অন্যদিকে সীমারীয়া-টুটিলাওয়া-হাজারীবাগের জঙ্গল আর বাঁয়ে আদিগন্ত পালামৌ। কি আশ্চর্য ভালো-লাগা জায়গাটাতে।

কে একজন মিস্ত্রীমতো লোক এসে দরজায় দাঁড়াল। মহুয়া বাবাকে ডাকল। তার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে দিল বাবার হাতে।

সান্যাল সাহেব কাগজটা হাতে নিয়ে বললেন, একি? তাঁর গলায় অবাক হওয়ার সুর। কুমারও পাশে এসে দাঁড়াল।

কাগজটা একটা ক্যাশমেমো। একটা মোটরপার্টসের দোকানের। লেখা তিনশো পনেরো টাকা। সঙ্গে একটা চিঠি। সুখন লিখেছে—

সবিনয় নিবেদন,

তিনশো টাকা দিয়েছিলেন, তার ক্যাশমেমো।

বেশি যা লেগেছে তা আর দিতে হবে না আপনাদের। মেরামতির কোনো বিল করিনি। কুমারবাবুকে বলবেন আমার যা কিছু অপরাধ ক্ষমা করে দিতে। আপনারা আপনার জনের মত আমার পর্ণকুটিরে উঠেছিলেন—এতেই আমি বড় খুশি। আমার আপনার জন বলতে বিশেষ কেউই নেই। এখানে বাঙালীর মুখও খুব বেশি দেখি না।

আপনাদের এ দুদিন বড়ই কষ্ট হল। আশা করি, এই কুঁড়ে ছেড়ে গিয়ে বেত্‌লার বাংলোয় আপনারা সুখেই থাকবেন। এই কষ্টর কথা ভুলে যাবেন।

কুমার চুপ করেছিল।

সান্যাল সাহেব মিস্ত্রীকে শুধোলেন, সুখনবাবু কোথায়?

মিস্ত্রী বলল, জানি না। গাড়ি ঠিক করেই চলে গেছেন।'

—কোথায় গেলেন? তাঁর না ঘরে শুয়ে থাকবার কথা?

মিস্ত্রী বলল, 'আমরাও বলেছিলাম। ওস্তাদ কারো কথা শোনেই না।'

সান্যাল সাহেব বললেন, 'দ্যাখো তো কি অন্যায়!'

কুমার বলল, 'আমাদের একটা ধন্যবাদ দেওয়ারও সুযোগ দিল না মিস্ত্রী। কিন্তু গাড়ি সারাবার পয়সা না হয় না-ই নিল, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার? এটাও এক ধরনের অপমান করা।'

মিস্ত্রী নমস্কার করে চলে গেল। বলে গেল যে, গাড়ি ধুয়েটুয়ে পরিষ্কার করিয়ে রেখে গেছে ওস্তাদ কারখানার বাইরে শিশুগাছতলায়।

মিস্ত্রী চলে গেলে কুমার আবার বলল, 'বিনি পয়সায় তো আমি কারো খাবার খাইনি। আর খাবোই বা কেন? জোর করে নুন খাইয়ে গুণ গাওয়াবার ব্যবস্থা। কায়দাটা ভালই।'

মহুয়া একবার চোখ তুলে তাকাল কুমারের দিকে। তারপর চুপ করে রইল।

মংলু চা করে নিয়ে এসেছিল। চা খেতে খেতে সান্যাল সাহেব ও কুমার জামা-কাপড় পরে নিলেন।

দেওয়ালে ঝোলানো ফ্লাস্কটা সবার অলক্ষ্যে হাতে নিয়ে মহুয়া রান্না ঘরে গেল। মংলুকে বলল, 'এটা তোর ওস্তাদের জন্য রেখে দিস মংলু। যখন শাকুয়া-টুঙে যাবেন তখন চা বানিয়ে দিস। আর এই লুডোটা তোর জন্য দিয়ে গেলাম। এই টাকাটা রাখ—মিষ্টি খাবি।'—বলেই কুড়িটা টাকা গুঁজে দিল মংলুর হাতে।

মংলু আপত্তি জানাল টাকাটা নিতে। বলল, ওস্তাদ রাগ করবে।

মহুয়া বলল, 'আর না-নিলে আমি যে রাগ করব? তোর ওস্তাদকে বলিস যে রাগ আমিও করতে পারি। আর বলিস যে, তোর ওস্তাদ বড় অসভ্য।'

মহুয়া চলে আসছিল রান্নাঘর ছেড়ে। কেন জানে না, তার চোখ জলে ভরে গেছিল। তার অভিমান, রাগ, তার উষ্মা যে দেখাবে সে সুযোগও লোকটা তাকে দিল না। এ যেন হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা; আর ক্লান্ত হওয়া।

সান্যাল সাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাইপে তামাক ভরছিলেন। বললেন, কইরে, মৌ হল তোর?

মহুয়া আসি বলে বাইরে এল।

সান্যাল সাহেব বললেন, 'মংলু, বাবা, মালগুলো এক এক করে তোলো এবার গাড়িতে।'

তারপর বললেন, 'কুমার যাও, বুটটা খুলে দাও গাড়ির।'

কুমার বারান্দায় বেরিয়ে মংলুকে ডাকল। বলল, 'এই ছোঁড়া এদিকে আয়, তুই অনেক করেছিস আমাদের জন্য, তোকে একটু বকশিস দিই।'

মংলু বলল, 'না, না নেব না।'

সান্যাল সাহেব বললেন, 'সে কি? নিয়ে নে, বাবা, নিয়ে নে।'

কুমার ভীষণ গর্বভরে দু' পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে একটা এক টাকার নোট বের করে মংলুকে দিল সবাইকে দেখিয়ে।

মহুয়ার সমস্ত অন্তর কুমারের দীনতায় কুঁকড়ে গেল। এই

এক ধরনের লোক। এরা দেখিয়ে দান দেয় এবং এমন দান যে, সে বলার নয়। এরাই গ্রাণ্ড হোটেলে খেয়ে উর্দি-পরা বেয়ারার সেলাম প্রত্যাশা করে টাকার নোট ফস্ করে বের করে। ফাইভস্টার হোটেলের পেজবয়কে কিছুই না করার জন্য পাঁচ টাকার নোট ছুঁড়ে দেয়। যেহেতু মংলু এই দানের সাক্ষী শুধু তারাই, আর কুমারের নীচ অন্তঃকরণ তাই-ই এমন জায়গায় তার হাত দিয়ে শুধু এক টাকার নোট বেরোয়।

এরপর কুমার আরও এক কাণ্ড করল। দুটো দশ টাকার নোট বের করে মংলুকে দিয়ে বলল, 'তোর ওস্তাদকে দিয়ে দিস—আমাদের খাওয়ার টাকা।'

সান্যাল সাহেব হৈ হৈ করে উঠলেন, বললেন, 'একি করছ কুমার? সুখনবাবু তো খাওয়ার টাকা চাননি? এ দিলে তাঁকে অপমান করা হবে। তাছাড়া টাকার কথাই যদি বলো, উনি বোধহয় আমাদের জন্য এক এক বেলাতেই কুড়ি টাকার বাজার করেছেন। তাছাড়া টাকাটাই তো সব নয়।'

তারপর মহুয়ার দিকে চেয়ে বললেন, যে আদর-যত্ন, আন্তরিকতা উনি যা দেখিয়েছেন তার দাম কি টাকায় দেওয়া যায়?'

কুমার টাকাটা পার্সে রাখতে রাখতে ভুরু তুলে বলল, 'টাকায় দাম দেওয়া যায় না, এমন কিছু আছে নাকি পৃথিবীতে? বেশ তো কুড়ি টাকা না হয় দুশো টাকাই নেবে—দুশো টাকাই দিচ্ছি।'

সান্যাল সাহেব বললেন, 'না, না! এতে আমি রাজী নই। উনি নিজে থাকলেও বা কথা ছিল, খাওয়ার টাকা এভাবে মংলুর হাতে দেওয়া যায় না।'

মহুয়া বলল, 'বাবা, তোমার একটা কার্ড দিয়ে যাও মংলুকে। আর ওঁর ঠিকানা তো আমরা জানিই। তুমি কলকাতায় ফিরে ওঁকে একটা চিঠি লিখে ধন্যবাদ জানিয়ো।'

সান্যাল সাহেব বললেন, 'কলকাতা কেন? বেত্লা থেকেই লিখব। তুই ভালোই বলেছিস।'

বলেই সান্যাল সাহেব তাঁর বাড়ি ও অফিসের ঠিকানা লেখা একটা কার্ড মংলুকে দিলেন।

মহুয়া খুশি হল। সে নিজে থেকে তার ঠিকানা দিতে

চেয়েছিল। সুখ নেয়নি, কিন্তু বাবার কার্ড থাকলে ঠিকানাও রেখে যাওয়া হল, আবার তার নিজের সন্ধানও রইল।

মংলু মালপত্র তুলে নিয়েছিল। ওরা ধীর পায়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। বেলা পড়ে গেছিল। এখন রোদ নেই, তবে আলো আছে। থাকবে এখনও আধঘণ্টা পৌনে এক ঘণ্টা।

বারান্দা ছেড়ে নেমে আসবার সময় মহুয়ার বুকের মধ্যেটা মুচড়ে উঠল। গাড়ির খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে একবার শকুয়া-টুঙের দিকে চাইল শেষবারের মত। পশ্চিমাকাশে নীল শান্তির ছবি হয়ে সন্ধ্যাতারাটা সবে উঠেছে। অনেক রকম পাখি ডাকছে শাকুয়া-টুঙের দিক থেকে।

মংলুর গাল টিপে দিয়ে একবার আদর করে মহুয়া গাড়িতে উঠল। সান্যাল সাহেব একটা দশ টাকার নোট মংলুর হাতে দিয়ে নিজেও উঠে পড়লেন। দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। ইঞ্জিন গুমরে উঠল।

ধুলো উড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে গাড়িটা বড় রাস্তার দিকে চলল।

মংলু দাঁড়িয়েছিল। লাটাখাম্বায় কে যেন জল তুলছিল। তার ক্যাঁচোর-কোঁচর শব্দে এই আসন্ন সন্ধ্যার নিস্তব্ধ বিষণ্ণতা আরো ভারী হয়ে উঠেছিল।

কাঁচা রাস্তাটা বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেছে। বাঁদিক দিয়ে একটা নালা বয়ে চলেছে রাস্তার সমান্তরালে। ওরা আধ মাইলটাক এসেছে।

কুমার বলল, ‘সব নিয়ে আসা হয়েছে তো? ফ্লাস্কটা? ফ্লাস্কটা তো দেখলাম না।

তারপর পেছনে মুখ ঘুরিয়ে মহুয়ার দিকে চেয়ে বলল, ‘আছে?’

মহুয়া বলল, ‘এ মাঃ। একদম ভুলে গেছি। রান্নাঘরে ছিল—আনতে মনে নেই।’

কুমার বলল, ‘রান্নাঘরে কেন? আমি তো বিকেলেও দেখলাম আমাদের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল।’

ছিল বুঝি? কই আমি দেখিনি তো?

মহুয়া মিথ্যে কথাটা সত্যির মত করে বলল।

কুমার বলল, ‘ঐ ছোঁড়া ঝেড়ে দিয়েছে। ওস্তাদের চেলা তো ! আর কত হবে ? তারপরই বলল, ব্যাক করব নাকি ?’

সান্যাল সাহেব বললেন, ‘ছাড়ো ছাড়ো, ফ্লাস্কের শোকে এত উতলা হওয়ার দরকার নেই। ফেরার ঝামেলা কোরো না।’

রাস্তাটা একটা বাঁক নিয়েছে। বাঁক নিয়েই পাকা রাস্তা। একটা মোড়। দু-তিনটে কাঁচা-পাকা রাস্তা এসে মিশেছে ওখানে, কিন্তু গন্তব্য-নির্দেশক কোনো বোর্ড-টোর্ড নেই।

কুমার গাড়ির গতি কমিয়ে বলল, ‘এ্যাই মরেছে ! এখন কোন দিকে যাই ? আবার রাস্তা ভুল করলেই তো চিত্তির। একেবারেই যা নাজেহাল।’

মোড়টার কাছেই রাস্তার ডানদিকে অনেকগুলো বড় বড় কালো ন্যাড়া পাথর। জায়গাটা শুধুই মহুয়া গাছ পত্রশূন্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করা বহু পুরনো সব মহীরুহ। ধুলো, শুকনো গাছ-গাছালি, আর শেষ বিকেলের গায়ের গন্ধের সঙ্গে নেশা মহুয়ার গন্ধে জায়গাটা ম-ম করছে।

গাড়িটা ঐখানে থামতেই হঠাৎ মহুয়ার চোখে পড়ল একটা তিন-পেয়ে কালো কুকুর পাথর বেয়ে উপর থেকে লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে গাড়ির দিকে। কালুয়া।

একি ! বলেই কুমার থেমে গেল।

ওর গলায় বিরক্তি ঝরে পড়ল। বিড়বিড় করে বলল, ‘শালা খাওয়ার টাকা নেবার জন্য পথে দাঁড়িয়ে আছে !’

সান্যাল সাহেব চাপা গলায় বললেন, কি হচ্ছে কুমার ?

কালুয়ার পিছু পিছু মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা সুখন ধীবে ধীরে নেমে আসছিল নীচে। ওকে দেখে মহুয়ার মনে হচ্ছিল যে তার সুখ বড় বুড়ো হয়ে গেছে একদিনেই। অভুক্ত, বড় ক্লান্ত, শ্রান্ত।

মনে হচ্ছিল, এইটুকু আসতেই ওর একযুগ লাগবে।

মহুয়া মনে মনে বলল লাগুক ; এক যুগই লাগুক। তবু তুমি নেমে এসো সুখ, তুমি কাছে এসো।

কাছে আসতেই দেখা গেল সুখনের হাতে একটা মহুয়ার বোতল। আগে বোধহয় আরো খেয়ে থাকবে। ধীর পায়ে নামার এও একটা কারণ।

মাঝপথে থেমে দাঁড়িয়ে সুখন মিস্ত্রী বোতলটাকে মুখে তুলে, মাথাটাকে পেছনে হেলিয়ে ঢক্‌ঢক্‌ করে আবার খেল অনেকখানি। গেঞ্জীর হাতায় জংলীর মত মুখ মুছল। তারপর কাছে এগিয়ে এল।

কুমার ফিসফিস করে বলল, এ্যাবসলুটলি ড্রাঙ্ক ?

মহুয়া মনে মনে বলল—মহুয়া খেয়েই ড্রাঙ্ক, আর হুইস্কী খেলে ড্রাঙ্ক নয় ! বাঃ !

কুমার বলল, 'তুমি গাড়ি থেকে নেমো না মহুয়া। খুব সাবধান। ব্যাটা বেহেড মাতাল। তোমার গায়ে-টায়ে হাত দিয়ে বসতে পারে।'

সান্যাল সাহেব গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই সুখন কাছে আসতেই বললেন, আরে আসুন আসুন। আমরা তো ভাবলাম আর দেখাই হল না বুঝি। কী যে লজ্জায় ফেললেন না আপনি আমাদের।'

ততক্ষণে মহুয়াও দরজা খুলে নেমে সান্যাল সাহেবের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সুখন সত্যিই মাতাল হয়ে গেছে বলে মনে হল মহুয়ার। ওর দিকে তাকিয়ে এক অপ্রকাশিতব্য কষ্টে মহুয়ার বুক ভেঙে যেতে লাগল।

কালুয়া ওর পায়ের কাছে দৌড়াদৌড়ি করে একবার রাস্তায় যাচ্ছিল, একবার গাড়ির কাছে আসছিল। সুখন জড়ানো গলায় ওকে ধমক দিয়ে বলল, 'এদিকে আয় কালুয়া। একটা পা তো গেছে, তোর কি গাড়ি চাপা পড়ে মরার ইচ্ছে হয়েছে ? একটু পর আবার টেনে টেনে বলল, 'তুই ছাড়া- ।

যে-লোকটা সুস্থ অবস্থায় দৃঢ়, শক্ত, অন্যের দয়া ও ভালো-বাসার প্রতি উদাসীনতায় মুখ-ফেরানো, সেই লোকটা মাতাল অবস্থায় যেন শিশু হয়ে গেছে ; বড় দুর্বল, অসহায় হয়ে পড়েছে।

সুখন কাছে এসে বোতলসুদ্ধ হাত তুলে বলল, নমস্কার। তারপর আবার জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, নমস্কার সান্যাল সাহেব, নমস্কার কুমার সাহেব।'

মহুয়ার কথা যেন ভুলেই গেছিল এমনিভাবে মহুয়ার দিকেও জোড়হাত তুলে বলল, 'নমস্কার।'

সান্যাল সাহেব বললেন, 'আপনি এখানে কি করছেন ?'

'আমি ?' কিছু না। কি আবার করব ?' তারপরেই বলল, 'ও না। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি কি যেন একটা করতে এসেছিলাম এখানে। এ্যাই এইবার মনে পড়েছে।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, এখানে আপনারা রাস্তা ভুল করতে পারতেন। আপনাদের আগেই বলে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মনে ছিল না। ভুল রাস্তায় গেলে সন্ধের পর ডাকাতির ভয় আছে, এদিকে তাই এলাম! ভাবলাম, রাস্তা বাতলে দিয়েই আমার ছুটি। ঠিক রাস্তা। ঠিক রাস্তায় আপনারা সব ভালো মত চলে গেলেই ছুটি।'

সান্যাল সাহেব উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'সে কি ? মাথায় এত বড় একটা উন্ড্ নিয়ে এতখানি হেঁটে এসেছেন ? আপনার না বিছানায় শুয়ে থাকার কথা ? কি করে আবার এতটা ফিরবেন। চলুন আপনাকে পেঁছে দিয়ে আসি।'

সুখন হাসল। মাতালের অপ্রকৃতিস্থ হাসি। তারপর বলল, 'বিছানাও আছে। ঐ যে। বলেই পাথরগুলোর দিকে দেখাল।' বলল, 'ঐখানেই শুয়েছিলাম।'

কুমার এতক্ষণে গাড়ি থেকে বেরিয়েছে। কুমারও দরদ দেখিয়ে বলল, 'সে কি ? ওখানে বিছে আছে, সাপ আছে, গরমের দিন।

সুখন হাসল। বলল, 'বিছে তো কতই কামড়াল। কই ? কিছু হল কি ? কি কুমার সাহেব, হল কিছু ?'

কুমার দ্ব্যর্থক কথাটার মানে বুঝতে পেরেই মনে মনে বলল— শালা। এখন তোমাকে একা পেয়েছি মাতল অবস্থায়। গাড়ির জ্যাক বের করে মাথায় মারলে এখানেই তোমাকে চিরতরে শুইয়ে দিয়ে যেতে পারতাম – কিন্তু সঙ্গে সব মিস্ত্রী-দরদী সাক্ষী থেকেই গড়বড় হয়ে গেল।

কুমার উত্তর দিল না। তারপর শুধোল, 'আমরা কোন্ দিকে যাব ?

সুখন হাত তুলে বলল, 'বাঁয়ে—সোজা বাঁয়ে চলে গেলেই ঠিক যাবেন।'

মহুয়া কি করবে, কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। ও বুঝছিল যে, ওর কিছু একটা বলা উচিত। আর কিছু বলার সুযোগ আসবে কি না কে জানে ? তাছাড়া ওর এই নীরবতায় বাবা ও কুমার সন্দেহ

করতে পারেন কিছু।

মহুয়া হঠাৎ বলল, 'ব্যথা কেমন আছে?'

সুখন চমকে উঠল গলার স্বর শুনে। বলল, 'ব্যথা?'

ব্যথার কথা যেন ভুলেই গেছিল। তারপর যেন মনে পড়ায় বলল, 'ও, ব্যথা একটু আছে। থাকবে কিছুদিন। তারপর চলে যাবে। ভাববেন না।'

সান্যাল সাহেব বললেন, 'আপনি যে কি করলেন না! গাড়ি সারাবার টাকা নিলেন না, দু'দিন খুব খাওয়ালেন সব নিজের খরচে—সত্যি, আপনার ঋণ শোধবার নয়। আমরা তো আপনার খদ্দের বই আর কিছুই নই; আমরা আপনার কে যে আমাদের জন্য নিজের ক্ষতি স্বীকার করলেন?'

সুখন একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর যেন অনেক দূর থেকে বলছে, যেন অন্য কেউ বলছে, এমন গলায় বলল, বলার আগে একবার মহুয়ার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিল; বলল,'কি জানেন সান্যাল সাহেব, জীবনে কিছু কিছু ক্ষতি থাকে, তা পূরণ হওয়ার নয়—তা চিরদিন ক্ষতিই থেকে যায়। সে সব ক্ষতি শুধু স্বীকারই করার।' তারপর বলল, 'মনে করুন এও সেরকম কোনো ক্ষতি। তাছাড়া যে ক্ষতি স্বীকার করে, সেই স্বীকার করার সুখটা তারই একার থাকে। সে কারণে যাদের জন্য অন্যের ক্ষতি হয়, তারা নিজেরা লাভবান হয় বলেই সুখের ভাগটা কিছু পায় না।'

কুমার মনে মনে বলল—শালা হেভী যাত্রা করছে তো! শালা বহুরূপী।

সান্যাল সাহেব বললেন, 'আপনার কথা শুনে কেউই বলবে না যে, আপনি মোটরগাড়ির মিস্ত্রী।'

সুখন হাসল। বলল, 'সেইটিই দুঃখ। খদ্দেররাও স্বীকার করে না; আমার মিস্ত্রীরাও নয়। আমার মেরামতির গুণ কেউই স্বীকার করল না।'

পরক্ষণেই বলল, 'অন্ধকার হয়ে এল। আর দেরি করা ঠিক নয় আপনাদের। এবার রওনা হয়ে পড়ুন। আবার কখনও এদিকে এলে, গাড়ি খারাপ হলে সুখন মিস্ত্রীকে খবর দেবেন—দুখন মিস্ত্রীর ভাই সুখন মিস্ত্রীকে। আর কি বলব?'

মহুয়ার পা দুটো মাটি আঁকড়ে ছিল ! ওর মুখে আসছিল যে, আমি যাব না। আমি আপনার কাছে থাকব। আমাকে আপনি কেড়ে নিন, জোর করুন আমার উপর, আপনার জোর দেখান। পরক্ষণেই ওর মনে হল, বড় দাম্ভিক তুমি সুখ। তুমি নিজে দুঃখ পাবে, অন্যকে দুঃখ দেবে। তুমি এরকমই।

সান্যাল সাহেব বললেন, আপনি এরকম করেন কেন? এরকম মহুয়া-ফহুয়া খাওয়া খারাপ। এরকম করবেন না।'

সুখন হাসল। বলল, 'এই—আমি এরকমই। আমি ভাল না।'

কুমার ছটফট করছিল ! বলল, 'এবার এগোনো যাক।'

সান্যাল সাহেব কিছু বলার আগেই, কুমারকে উদ্দেশ্য করে সুখন বলল, 'ওহোঃ, ভুলেই গেছিলাম। আপনার জন্য একটা জিনিস এনেছিলাম।'

বলেই, পকেট থেকে একগাদা পলাশ ফুল বের করে কুমারকে দিল সুখন।

কুমার স্মার্টনেস দেখিয়ে নাকের কাছে তুলল ফুলগুলোকে।

সুখন বলল, 'নাকের অত কাছে নেবেন না—এতে পিঁপড়ে থাকে—কামড়ে দেবে।'

তারপর বলল, 'আরো একটা জিনিস দেবো ভেবেছিলাম—একটা পাখি—টুঁই পাখি। কিন্তু এত অল্প সময়ে যোগাড় করা গেল না।'

- সেটা আবার কি পাখি?

দেখেননি? ছোট্ট, মিষ্টি পাখি—সবুজ সবুজ—লেজ-ঝোলা—উড়ে উড়ে ডাকে টিঁ-টুঁই—টিঁ-টিঁ-টুঁই···।

কুমার এই পলাশ ও টুঁই পাখির ব্যাপারটা বুঝল না।

তবে এটুকু বুঝল যে, এর পেছনে কোনো রহস্য আছে।

শালা হেভী খচ্চর।

কুমার বলল, 'চলুন, সান্যাল সাহেব, এবার যাওয়া যাক।'

বলেই কুমার গাড়িতে গিয়ে বসল ড্রাইভিং-সীটে।

তারপর সান্যাল সাহেব ও সুখনকে নমস্কার করে উঠে বসলেন।

মহুয়া উঠল শেষে।

সুখন মহুয়ার দিকে এগিয়ে গেল একটু। হঠাৎ মহুয়ার হাত

দুটো দু' হাতে ধরে বলল, 'নমস্কার দিদিমণি। অনেক কষ্ট করে গেলেন এখানে। সুখন মিস্ত্রীকে মনে থাকবে না, জানি আপনাদের কারোই ; কিন্তু আপনাদের সবাইকেই মনে থাকবে সুখনমিস্ত্রীর।,

মহুয়া মুখ নামিয়ে নিল। চোখটা ভারী হয়ে এল মহুয়ার। গলার কাছে কি যেন একটা চাপা কষ্ট দলা পাকিয়ে এল। মহুয়া বলল, চলি।

সুখন দরজাটা নিজের হাতে বন্ধ করে দিল। তারপর বলল, 'চলি চলি বলতে নেই, বলতে হয় আসি। এও জানেন না ?' তারপর আবার নমস্কার করে বলল,'এদিকে এলে আবার আসবেন দিদিমণি।'

ইঞ্জিনটা স্টার্ট করেই আবার বন্ধ করে দিল কুমার। কুমার ডাকল সুখনকে ! বলল, 'এই যে এদিকে শুনুন।'

সুখন অবাক হয়ে ওদিকে যেতে যেতে বলল, 'কি ব্যাপার ? আপনি তো সুখন মিস্ত্রীকে তুমি করেই বলতেন ! হঠাৎ অধমের এ উন্নতি কেন ?'

সান্যাল সাহেব ও মহুয়া অবাক হয়ে কুমারের দিকে তাকিয়েছিল। কুমার কেন ডাকল, ওরা বুঝল না।

সুখন সামনের ডানদিকের দরজার কাছে গেলে কুমার হিপ্ পকেট থেকে পার্স বার করে দুটো একশ টাকার নোট ফট্ করে বের করে সুখনের হাতে দিয়ে বলল, 'আমাদের খাওয়া-দাওয়ার খরচা।'

সুখন কুঁজো হয়ে গাড়ির জানালার কাছে মুখ নামিয়ে এনেছিল। টাকাটা হাতে নিয়ে ঐভাবেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল, 'এটার কি খুবই দরকার ছিল ?'

কুমার বলল,'এটা না নিলে আমায় খুব ছোট লাগবে নিজেকে।'

সুখন আশ্চর্য হবার মত মুখ করে থাকল অনেকক্ষণ। যেন ও বোবা হয়ে গেছে। তারপর বলল, 'আপনারও তাহলে ছোট লাগে নিজেকে কখনও কখনও ? আশ্চর্য।'

কুমার রাগত গলায় বলল, 'মানে ?'

সুখন জবাব না দিয়ে মহুয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এই যাঃ, একদম ভুলেই গেছিলাম। আপনার জন্যও একটা জিনিস এনে-

ছিলাম। গরীব মিস্ত্রী - আর তো কিছুই দেওয়ার নেই - বলেই পকেট হাতড়ে একমুঠো চকচকে বল-বীয়ারিং বের করল সুখন। বের করে, জানালা গলিয়ে হাত ঢুকিয়ে মহুয়ার হাতে দিল।

প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশিক্ষণ মহুয়ার হাতে হাত ছুঁইয়ে রাখল ও। তারপর বলল, 'আপনি এখনও বড় ছেলেমানুষ আছেন দিদিমণি।'

সান্যাল সাহেবও চাইছিলেন যে এবার এগোনো যাক। টাকাটা দিয়ে ফেলে কুমার এখন কি নতুন বিপত্তি বাধাল কে জানে? কুমারটা একটা স্কাউণ্ড্রেল। সব জিনিসেরই সীমা থাকা উচিত। ওর অভদ্রতার কোনো সীমা নেই।

কুমার আর কিছু না বলে ইঞ্জিনের সুইচ ঘোরাল। গাড়িটাকে গীয়ারে দিল।

সুখন তখনও গাড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিল। সুখন বলল, 'এক সেকেণ্ড, আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। একটা কথা বলে নিই।'

তারপর একটু থেমে বলল, 'কুমার সাহেব, টাকা—বড় বেশি টাকা চিনেছেন আপনি। তাই না? জিন্দেগীতে টাকার চেয়েও বড় বহত্ বহত্ জিনিস আছে। এখনও বয়স আছে, দিন আছে; সেসব চিনুন।'

তারপর বলল,'এই নিন্। বলেই একশো টাকার নোট দুটোকে ফস্স ফস্স করে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে কুমারের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে সুখন বলল, 'এই জঙ্গলে পাহাড়ে এমন লক্ষ লক্ষ শুকনো পাতা এই চোত্-বেশেখে হাওয়ায় ওড়ে।'

তারপরই মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল, 'যান স্টার্ট দিন।'

কুমারকে বলতে হল না আর। এ্যাক্সিলারেটর পুরো দাবিয়ে দিয়ে স্টীয়ারিং সোজা ধরে বসেছিল কুমার। ক্লাচে পা রেখে। ক্লাচ থেকে হঠাৎ পা সরাতেই গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে ভয়-পাওয়া শুয়োরের মত লাফিয়ে গেল গাড়িটা সামনে।

কুমার ভয় পেয়ে গেছিল। মনে মনে বলল, এ শালাকে বিশ্বাস নেই। টাকা ছিঁড়েও হয়ত শান্তি হয়নি, এবার দৌড়ে এসে হয়তো মেরেই বসবে।

সুখন ঐখানেই দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিল। সান্যাল সাহেব জানালা

দিয়ে। মহুয়া পেছনের কাঁচ দিয়ে। একটু পরেই রাস্তা বাঁক নিল।

সুখনকে আর দেখা গেল না। আবছা অন্ধকার, কালো পাথর, ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল, এ-সবের মধ্যে সুখনের দাঁড়িয়ে থাকা, হাত-নাড়া চেহারাটা হঠাৎ হারিয়ে গেল।

মহুয়া পেছনের সীটে হেলান দিয়ে আধশোয়া ভঙ্গীতে বসেছিল।

গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে দিয়েছিল কুমার। ড্যাশবোর্ডের আলোতে ও হেডলাইট ইণ্ডিকেটরের সবুজ আলোতে ড্যাশবোর্ডের উপরে রাখা একগুচ্ছ পলাশের লাল রঙে কেমন সবুজ আভা লেগেছে।

মহুয়া হাতের মধ্যে বল-বীয়ারিংগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। অনেকক্ষণ হাতের মধ্যে থাকায় গরম হয়ে উঠেছে ওগুলো।

হঠাৎ সান্যাল সাহেব বললেন,'টুঁই পাখিটা কি পাখি ?

কুমার তাচ্ছিল্যের গলায় বলল,'আপনিও যেমন! ব্যাটা মিস্ত্রী নিশ্চয়ই মন-গড়া নাম দিয়েছে কোনো পাখির। আজব চীজ একটি। সুখন মিস্ত্রী!

তারপরই পেছনে মুখ ঘুরিয়ে খুশি গলায় কুমার বলল, মহুয়ার কি হল ? চুপচাপ কেন! অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বেত্‌লা পৌঁছব আমরা।'

মহুয়া জবাব দিল না। সান্যাল সাহেব বললেন, 'কি রে মৌ ?'

মহুয়া বলল, উঁ।

—কি হল তোর ?

মহুয়া বলল, 'কিছু না।'

—তবে, চুপ করে কেন ?

মহুয়া উত্তর দিল না অনেকক্ষণ।

তারপর অস্ফুটে বলল, ভাবছি···।